বিস্মৃত লেখক

প্রদ্যোৎ কর

নব সাহিত্য প্রকাশনী
১২৮/১এ রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৭০০০০৯

bismrita lekhak—a book on
literary essays by Pradyot Kar

প্রকাশক
নব সাহিত্য প্রকাশনী
১২৮/১এ রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
পংকজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রক
গীতা প্রিন্টার্স
২১ পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

পিতৃদেবের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

লেখকের নিবেদন

"বিস্মৃত লেখক" কথাটার মধ্যে হয়ত কিছুটা আপাতবিরোধ রয়েছে, কারণ কোন লেখক বিস্মৃত বা অনুস্মৃত হবেন কিনা তা পাঠকের রুচির উপর নির্ভর করে। এই রুচি নিঃসন্দেহে সময় ও কালের ওপর নির্ভরশীল। একসময় যা অতি উপাদেয় স্বাদু ও আকর্ষক বলে আদৃত হয়েছিল কিছুদিন পরে হয়ত তাই নিতান্ত অপাংক্তেয় হয়ে দাঁড়ায়। একসময় যে লেখা মৌলিকতা ও অভিনবত্ব নিয়ে পাঠক সমাজে প্রচন্ড আলোড়ন তুলেছিল কালের প্রবাহমানতায় তাই আবার পরবর্তী যুগে সকল ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলে।

সুতরাং পরবর্তী যুগের পাঠকের মনে যদি কোন লেখকের স্থায়ী আসন না থাকে তা নিয়ে আক্ষেপের বিশেষ কারণ নেই। কারণ নির্মম উদাসীন কাল ততটুকুই রাখে যা রাখার মতন।

নিষ্ঠুর এই সত্যকে মেনে নিয়েই বলা যায় যেহেতু সাহিত্যের গতিশীল ক্রমবর্ধমানতা অনেকেরই সমবেত প্রয়াস ও প্রচেষ্টার পরিণতি, তাই ছোট বড় মাঝারি সকল লেখকেরই কিছু অবদান এর পিছনে থেকে যায়। এবং সাহিত্যে ধারাবাহিকতা নির্ধারণে সেইসব অসংখ্য আপাত বিস্মৃত লেখকদের অবদানও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। কালজয়ী অমরত্বের দাবীদার না হলেও এদের নিরলস সাহিত্যসাধনার ফলেই যে বাংলা সাহিত্য আজকের অবয়ব লাভ করেছে একথা আমাদের ভুলে যাওয়া অনুচিত।

এই মানসতাই প্রেরণা জুগিয়েছে বর্তমান গ্রন্থ প্রণয়নে। একথা কোনো ভাবেই বলার উদ্দেশ্য নয় যে মাত্র এই আট জনই আজ বিস্মৃতির পঙ্ক থেকে উদ্ধারযোগ্য। আরও অগণিত সাহিত্যব্রতী রয়েছেন বিগত শত বৎসরের অধিককাল ধরে যাঁরা আজ পূর্ণ অথবা অর্ধ বিস্মৃত অথচ একসময়ে খুবই জনপ্রিয় ও আদৃত ছিলেন তাঁরা। তাঁদের রচনাও পঠন পাঠন আমাদের একান্ত কর্তব্য।

বর্তমান গ্রন্থে যাঁরা আলোচিত হয়েছেন তাঁরা হলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত, মণীন্দ্র লাল বসু গোকুল নাগ, রমেশচন্দ্র সেন, অমরেন্দ্র ঘোষ এবং অনুরূপা দেবী। আজ এটা সর্বজনস্বীকৃত যে এঁরা সকলেই নিজেদের জীবনকালে বাংলা সাহিত্যপ্রাঙ্গণে অতি উজ্জ্বলভাবেই বিরাজ করেছিলেন নিজেদের প্রতিভা, স্বাতন্ত্র্যের জন্যে। আমাদের সাহিত্যের আকাশে এঁরা কেউ হয়ত সূর্যের মত ভাস্বর ছিলেন না কিন্তু তারকার জ্যোতি সকলেরই ছিল। এঁদের অবদানও আমাদের সাহিত্যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়।

উল্লিখিত সাহিত্যিকদের কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, সাহিত্যসৃষ্টি ও মৌল প্রেরণা নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এঁদের সম্বন্ধে বরেণ্য পন্ডিত ও বিদগ্ধ সাহিত্য সমালোচকদের বহু মনোগ্রাহী ও রসগ্রাহী আলোচনা রয়েছে। তাঁদের রচনা থেকে প্রয়োজনমত সাহায্য নিয়েছি। তাঁদের রচনা ও মূল্যায়ন সমগ্র দেশেরই অমূল্য সম্পদ তাই কোন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাটাই হবে বাহুল্য মাত্র।

তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে অনুজপ্রতিম বন্ধু ও সহকর্মী শ্যামল মৈত্রের প্রতি, কারণ শুধুমাত্র তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নিরলস তাগিদে এই পুস্তকের মুদ্রণ সম্ভব হয়েছে।

প্রচ্ছদ এঁকে দিয়ে বন্ধুবর পংকজ বন্দ্যোপাধ্যায় অশেষ উপকার করেছেন, তাঁর সাহায্যও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

প্রদ্যোৎ কর

মহালয়া,
২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯
ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া
জেলা হুগলী।

বিস্মৃত লেখক

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১)

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত শতাব্দীর সাহিত্যে একটি স্মরণীয় নাম। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া বাঙালায় প্রধান লেখকদের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।' এই পরিচিতি দীর্ঘস্থায়ী না হইলেও হাস্যরস সৃষ্টি অথবা আরও সংকুচিত অর্থে রঙ্গ-ব্যঙ্গের লেখক হিসাবে তাঁর প্রসিদ্ধি প্রশ্নাতীত। তবে নিছক রঙ্গের জন্য তিনি কলম ধরেন নি। ব্যঙ্গের জন্যই রঙ্গরসের আমদানি। আর ব্যঙ্গের পিছনেও একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। শুধুমাত্র রহস্য রসিকতার জন্য তিনি একছত্রও লেখেননি। পাঁচু ঠাকুরের বয়ানে তিনি একথা ব্যক্ত করেছেন। "আমি সরস রহস্য লিখতে পারিয়াছি কিনা বলিতে পারি না কিন্তু রসিকতার অনুরোধে কিছু লিখি নাই ইহা যেন পাঠক মহাশয়দের —এখন আবার বলিতে হয় পাঠিকা মহাশয়াদের মনে থাকে।" 'পঞ্চানন্দের প্রতি উপদেশ' নক্সায় তিনি বলেছেন, 'মহাব্রত উদ্‌যাপনের নিমিত্ত দেবদত্ত মহাস্ত্র তোমাকে দিয়াছি। বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিলে সকল বিঘ্ন দূর হইবে, যে পাপী সে ভয় করে। তুমি পাপীর শাস্তিবিধান করিবে।'

তাঁর নিজের এই উক্তিসমূহ অনুধাবন করলেই উপলব্ধ হবে যে বিশুদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টি অথবা পরিশীলিত হাস্যরসের সঞ্চার তাঁর অভীষ্ট ছিল না। একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল ; তবে সেটা উচ্ছল পরিহাস নির্মোকিত। এই উদ্দেশ্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই ইন্দ্রনাথের সাধনার মৌল প্রেরণার সন্ধান পাওয়া যাবে।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসিক অবস্থান ছিল বঙ্কিমসূর্যের পরিমন্ডলে। যে আদর্শ ও মতবাদের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সময় তাঁর দুর্লঙ্ঘ্য সাহিত্যপ্রতিভাকে ব্যাহত করেছেন, সীমিত করেছেন নিজের উচ্চমানসলোকের দূরপ্রসারী দৃষ্টি, সেই আদর্শ ও মতবাদের পরিপূর্ণ সমর্থক ছিলেন যাঁরা, ইন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্রের একদেশদর্শিতা, বহু প্রগতিশীল চিন্তা ও আন্দোলনের প্রতি বিমুখতা, এমনকি সক্রিয় বিরোধিতা, সব কিছুকে ম্লান

করে আজ বিরাজ করছে তাঁর সুমহান সাহিত্য প্রতিভা, স্রষ্টা ও দ্রষ্টার বিরাট-ব্যক্তিরূপ। কিন্তু অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে তাঁদের সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা আমাদের সামনে মুখ্য হয়েই প্রতীয়মান; যেহেতু এসকলকে গৌণ করার মত প্রতিভার অধিকারী তাঁরা ছিলেন না।

ইংরেজদের মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার স্পর্শ পেয়ে একদল নব্য শিক্ষিতের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল দেশীয় সব কিছুকে নস্যাৎ করার একটা প্রবণতা। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবমাননার মধ্য দিয়েই তারা নিজেদের সুশিক্ষা ও প্রগতিশীলতার পরিচয় দেবার একটা সহজ উপায় বেছে নিয়েছিল। আর তারই প্রতিক্রিয়া রূপে দেখা দিল অন্য মানসিকতার বিপরীতপন্থী আরেকটি দল। এঁরা ইংরেজী শিক্ষার আলো পেয়েও আঁকড়ে ধরতে চাইলেন দেশীয় সকল রীতি নীতি আচার অনুষ্ঠান, একান্ত অমানবিক হৃদয়হীন রীতি প্রকরণ সমূহকেও তাঁরা বিজ্ঞানের অবতারণা করে ও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-বিবেকানন্দের মধ্যে যার সুসমঞ্জস সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল, দুর্বল অক্ষমদের কূপমন্ডূকতায় তাই অনেকটা বিকৃত বর্ণহীন ও হাস্যাস্পদ হয়ে উঠল।

ব্রাহ্ম সমাজের অভ্যুদয় গোটা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছিল। যদিও এই ধর্মের মূল আদর্শ ও ভাব প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গভীরে নিহিত কিন্তু স্বল্পশিক্ষিত নব আলোকিতদের প্রবণতা ছিল পাশ্চাত্যমুখী এবং নিজেদের ধর্মান্তরণকে একটা উন্নত মানসলোকে উত্তরণ বলে তারা মনে করতেন এবং গর্ববোধ করতেন। স্বভাবতই Hindu revivalistদের আক্রমণীয়দের মধ্যে এঁরাও একটা মুখ্য স্থান অধিকার করেছিলেন।

এই রকম একটা পরিস্থিতিতেই ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। তাঁর কলমের খোঁচা একদিকে যেমন বর্ষিত হয়েছিল অন্তঃসারশূন্য বিকৃত রুচি ইংরেজী শিক্ষিতদের প্রতি, তেমনি অকারণ ও অসঙ্গতভাবেই তিনি ব্রাহ্ম সমাজের উপর নামিয়ে এনেছিলেন তীক্ষ্ণধার বিদ্রূপবাণ। গুরুগম্ভীর প্রাবন্ধিকের ভূমিকা তিনি নেন নি। সরস চটুল বাক্যবাণে, ছড়া-কবিতা-নক্সার মাধ্যমে তিনি নিজের চিন্তা ও কর্মধারাকে প্রভাবিত করেছিলেন। যুক্তির মাধ্যমে, তথ্য ও তত্ত্বের বিদগ্ধ ও বিশদ অবতারণায় নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অনেক সময় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে; সেটা প্রভূত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমসাপেক্ষ

যার দায়দায়িত্ব প্রচুর। কিন্তু হালকা চালে রসসৃষ্টির আড়ালে যদি প্রতিপক্ষের উপর শাণিত অস্ত্র নিক্ষেপ করা যায় তবে নিক্ষেপকারী রঙ্গ রসিকতায় আবৃত থেকে সব রকম দায়মুক্ত হতে পারেন কিন্তু ঈপ্সিত ফললাভে ঘাটতি হয় না। ইন্দ্রনাথ তাই ছিলেন ওই পথের অচঞ্চল সাধক।

বর্ধমানের গঙ্গাটিকুরিতে আদি নিবাস হলেও তাঁর জন্ম হয়েছিল পান্ডুগ্রামের মাতুলালয়ে; পিতা রামচরণ ছিলেন পূর্ণিয়ার আইনজীবী; ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করার পরে কিছুকালের জন্য শিক্ষকতা করেছিলেন বীরভূমের হেতমপুরে এবং পরে বর্ধমনের ওকড়সা স্কুলে প্রধান শিক্ষকরূপেও কর্মরত ছিলেন। এই সময়েই স্বদেশ-কল্যাণমূলক নানা চিন্তা দেশ ও জাতি গঠনের প্রবল বাসনা তাঁর মধ্যে—অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। প্রকাশ্যভাবে সমাজ সংস্কার বা সক্রিয় রাজনীতি বর্জন করে তিনি যুক্ত হলেন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রপত্রিকার সংগে। ১৮৭১ সালে বি. এ. পাশ করার পর শিক্ষকতা ছেড়ে আইন ব্যবসা শুরু করেন, এবং ব্রতী হলেন অভীষ্ট কর্মসিদ্ধির জন্য, নিজের ভাবনায় অন্যকে ভাবিত করে তুলতে। পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, কলকাতা হাইকোর্ট এবং অবশেষে বর্ধমানে আইন ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু লেখনী থেমে থাকেনি কখনও। পঞ্চানন্দ নামে অবতীর্ণ হলেন সাহিত্যের অংগনে, উদ্দেশ্য লোক হাসানোর ছলে ভিন্নপন্থীদের চাবকানো।

বিভিন্ন সাময়িকীতে কিছু সরস ও চটুল রচনার পর প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'কল্পতরু'। আজকের পাঠকের বিচারে ঔপন্যাসিক গুণাবলী এই গ্রন্থে প্রায় অস্তিত্বহীন কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এটিকে অনেক উঁচুমানের বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি এও বলেছিলেন যে, আলালের ঘরের দুলাল, বা হুতোম প্যাঁচার নকশার চাইতে কল্পতরু অনেক বেশী সাহিত্যগুণ সম্বলিত। বাংলা সাহিত্যে এই নবীন লেখককে অকুন্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেদিনের সাহিত্যসম্রাট। বঙ্কিমচন্দ্রের এই মূল্যায়নে সায় দিতে পারেন নি পরবর্তীকালের রসগ্রাহী পাঠক ও সমালোচকবৃন্দ। সরস টিকাটিপ্পনী, রচনার প্রসাদগুণ ও কৌতুকমন্ডিত কিছু উপাদান ছাড়া উপন্যাসোচিত কোন উৎকর্ষ এই গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ ঘটনার পারম্পর্য, চরিত্রের ক্রমবিকাশ, প্লটের ঘনবদ্ধতা এবং কেন্দ্রাভিমুখী কোন ঐক্য এর মধ্যে নেই। গ্রাম্যতা এবং নিম্নমানের রসিকতা সত্ত্বেও উপন্যাস হিসাবে এবং বাংলা উপন্যাসের

সূচনাকারী বলে 'আলালের ঘরের দুলাল' আজও সর্বজন স্বীকৃত। ঠকচাচা, মতিলাল প্রভৃতি চরিত্র স্ব স্ব গণ্ডীর মধ্যে থেকেও যে সার্থকতা লাভ করেছে ইন্দ্রনাথের চরিত্রগুলি সে পর্যায়ে উন্নীত হয় নি। স্বার্থপর পরোপজীবী গবেশচন্দ্র, নীচ প্রবঞ্চক রামদাস, ধর্মের ভেকধারী বাবাজী সব চরিত্রগুলিই কিছুটা কৃত্রিম ও অবাস্তব রূপেই চিত্রিত হয়েছে। লেখকের উদ্দেশ্য ছিল ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, হাস্য পরিহাস করা আর তাতেই তিনি এমন নিমগ্ন ছিলেন যে কাহিনীর ক্রমান্বয়িতা চরিত্রগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে ছিলেন অনবধান এবং উদাসীন। অথবা বলা যেতে পারে সজ্ঞান ও সচেতন প্রশ্রয়ই ছিল লেখকের এই ধরণের উৎকট রসসৃষ্টির পিছনে। ভাষা ও শব্দের প্রয়োগে চরিত্রগুলির উৎকেন্দ্রিকতায় যে হাসির ফোয়ারার সৃষ্টি হয় তাতে তাৎক্ষণিক একটা তৃপ্তি বা কৌতুক অনুভব করা যায়। ফলে সে সময়ে এর জনপ্রিয়তাও ছিল অপ্রতিরোধ্য। পরোপজীবী গবেশচন্দ্রের দৈহিক আকৃতি ও মানসিক প্রকৃতি বর্ণনায় তিনি যথেচ্ছ কৌতুকের সাহায্য নিয়েছেন, উপমান এবং উপমেয়র সাযুজ্য কিংবা শোভনতার প্রতি দৃক্‌পাত না করেই। "বাস্তবিক গবেশ রায় যে একজন অসম সাহসিক লোক ইহা তদীয় মূর্তি দর্শনেই প্রতীয়মান হয়। মস্তকের কেশ স্ফুটপুষ্ট যেন যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত কোন রকমে শূকর কেশর সম্মার্জনীর শাসনে অল্প প্রতি-নিবৃত্ত।" চক্ষু, কর্ণ, গ্রীবা, কণ্ঠ, বাহু প্রভৃতি প্রতিটি অংগ সম্বন্ধে প্রযুক্ত বিশেষণসমূহ খুবই কৌতুকমণ্ডিত। যেহেতু লেখক চেয়েছেন তাকে একটি উৎকট জীবরূপে আঁকতে তাই বল্গাহীনভাবে লেখনী চালিয়েছেন মাত্রাতিরেকের কথা চিন্তা না করে।

গবেশচন্দ্র মধুসূদনের কাছে এলে পর মধুসূদনের মনে যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল ইন্দ্রনাথ তার বর্ণনা করেছেন, 'হাবুডুবু খাইতে খাইতে পদ্মার জলে ভাসিয়া যাইবার সময় তুলার বস্তা পাইলে যে সুখ, অন্ধকার গলি-রাস্তার ভিতর লণ্ঠন হস্তে পরিচিত ব্যক্তির সংগ পাইলে যেমন সুখ, নিদ্রিত গৃহস্থের স্বার অনর্গল পাইলে চোরের যেমন সুখ, বাড়ীর সম্মুখে শুঁড়ির দোকান প্রতিষ্ঠিত হইলে মাতালের যে রকম সুখ, এবং পরের ব্যয়ে পুস্তক প্রকাশিত হইতে পারিবে ইহা শুনিতে পাইলে গ্রন্থকার বিশেষের যেমন সুখ, গবেশ রায়কে পাইয়া মধুসূদন তদপেক্ষাও অধিক সুখী হইল।'

স্পষ্টই বোঝা যায় ব্যঙ্গ কৌতুক, কথার বাহার ছাড়া এখানে বিশেষ কিছু

নাই ; উপমাগুলির প্রয়োগ অনেকটাই উদ্দাম ও অসংযত। অবশ্য পরিশুদ্ধ হাসির ধারাও নিতান্ত অপ্রতুল নয়। 'স্ত্রীলোক চেতন নহে, অচেতন নহে, উদ্ভিদ নহে। তিন প্রকার পদার্থের কোন পদার্থই নহে, স্ত্রীলোক পৃথিবীতে হয় না, কেবল আকাশে ফোটে। স্ত্রীলোকের কণ্ঠে শব্দ হয় না কেবল সংগীত হয় ; নেত্রে দৃষ্টি হয় না কেবল কটাক্ষ হয়। ওষ্ঠাধরে হাসি নাই, কেবল বিজলী ……ওই যে বাহু মনে করিতেছ, অশ্বমেধের অশ্ব বাঁধিবার নিমিত্ত বনলতা, তুমি যাহাকে পাদচারণ মনে করিতেছ—তাহা পাদচারণ নহে জ্যোতির্লীলা মাত্র।' আবার নর-মৎকুনের যে ভীষণ সংগ্রাম তিনি বিবৃত করেছেন তা যেমন প্রীতিপ্রদ যেমনি কৌতুকপ্রিয়তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। 'নর-মৎকুনের ভীষণ রণ বর্ণনে আমার প্রায় সাধ হইতেছে কিন্তু তাহাতো আমি পারিব না। কেহই যাহা করিতে সাহস পায় নাই আমি সামান্য ব্যক্তি সে বিষয়ে কেমন করিয়া হস্তক্ষেপ করিব। নিরাপদ কন্দর হইতে ছারপোকার সেই উদ্যমপূর্ণ নিষ্ক্রমণ, সেই নিঃশব্দ পদসঞ্চার মানব গ্রীবার উপর সেই অভ্রভেদী অব্যর্থ সন্ধান, পার্শ্ব পরিবর্তন হইতে না হইতে বিদ্যুৎ-গতিতে অন্তর্ধান এই সব বর্ণনা করা কি আমার সাধ্য।'

পরবর্তী উপন্যাস 'ক্ষুদিরাম' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৮ সালে। স্বয়ং লেখক এটিকে গালগল্প বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু অনেকের মতে উপন্যাসের মানদন্ডে ক্ষুদিরাম কল্পতরুর চাইতে উন্নততর। আর যাই হোক ক্ষুদিরামের মধ্যে একটি কাহিনীগত ঐক্য আছে, যদিও উদ্দেশ্যমূলক বলে উদ্দেশ্যের নিপীড়নে সাহিত্য সৌকুমার্য প্রায় অন্তর্হিত। এই উপন্যাস মূলতঃ ব্রাহ্ম সমাজের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার। কমলিনীর চরিত্রচিত্রণে এই ধর্মের দুর্নীতি-গ্রস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার ইঙ্গিত রয়েছে। ক্ষুদিরামের চরিত্রে মূল্যবোধের অবনমনকে সুচিহ্নিত করে গোটা সমাজকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। লেখকের শ্লেষ ও কটাক্ষ কখনও অতি উগ্ররূপ ধারণ করেছে বটে তবু এর কিছু অংশ, কিছু বক্তব্য মার্জিত রুচিবোধে পরিস্নাত।

উপন্যাস রচনায় অসফল ইন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ-কৌতুকে নিজেকে সফল ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'উৎকৃষ্ট কাব্যম্' তাঁর প্রথম ছাপা বই, ছাত্রাবস্থায় লেখা। পরবর্তীকালে যে রঙ্গ রসিকতার জন্য তাঁর খ্যাতি এই গ্রন্থেই তা মুকুলিত। তারুণ্যের উচ্ছ্বাস, বাঁকা একটা দৃষ্টিভঙ্গী, অগোছালো রচনারীতি ও উদ্দাম

উপমাপ্রয়োগ এবং স্থানে স্থানে পান্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের চকিত প্রকাশ, সব কিছুরই অংকুর এই উৎকৃষ্ট কাব্যমে রয়েছে।

'সদ্য জনমিলা, অমনি
কবিতাইলা কত কবিসুত তব।'

নিজের আত্মপ্রকাশ তাও যেন পরম এক হাসি ঠাট্টার বিষয়! ইন্দ্রনাথ লেখেন,

'বঙ্কিমের মত নাই কলমের জোর,
নবাখ্যা লেখা হল না, এ রাতি তো ভোর।
ওই দেখ দীনবন্ধু। তোমায় দেখিয়া
নাটক লিখিতে যান কত কত মিয়া।
শিকায় তুলিয়া মান, কানকাটা যত
দুই গালে চুনকালি লেপি অবিরত
লেখনী সিঁধের কাটি হাতে চুরি করি
বই না বাহির হতে হয় ধরাধরি।

মেকী অক্ষম যশোলোভীর প্রতি কশাঘাত জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই শুরু। অব্যাহত শেষ দিন পর্যন্ত। একটু সাবধান বা সতর্ক হলে তাঁর লেখনী থেকে উৎকৃষ্ট অনেক কিছুই পাওয়া যেত। কারণ তাঁর উদ্দামতা ও প্রগল্‌ভতার মধ্যে সার্থক পদসৃষ্টি ও বিদ্যাবত্তার পরিচয়ও মাঝে মাঝে ঠিকরে বেরিয়ে আসে। স্বতঃস্ফূর্ত বাক্‌চাতুর্যের সঙ্গে সহজাত কবিত্ব অনেক স্থানেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেমন,

মহাদেব গাইলেন পঞ্চরসনায়—
ধরণীর কথা, আহা! সেই মহাদেব
যিনি শূলপাণি শিব, ভূত মোসায়েব
শ্মশান নিবাসী—(হেন কত বিশেষণ
আছে, তাহা দিয়া ফল বল কি এখন ?)

অথবা………………………………………………

গ্রন্থ লিখিবারে পারি, লেখাও হয়েছে।
কিন্তু না বিকায় কভু, দোকানে রয়েছে ;
তাই এইবার পুন লিখিলাম বই
কর্ণরূপ মুখে খাব যশোরূপ দই।'

অবশ্যই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল 'ভারত উদ্ধার' কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যের বাস্তবানুগ অথচ উদ্ভট চরিত্রসমূহ তাঁর বিদ্রূপ ও পরিহাস-প্রবণতার নিদর্শন হিসাবে আজও উজ্জ্বল ও দ্যুতিময়। বর্তমান কালের মেকী ভণ্ড দেশ-প্রেমিকদের কথা চিন্তা করলে এই কাব্যের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মে। 'ভারত উদ্ধার' মেঘনাদ বধের সার্থক প্যারডি। মধুসূদনেব নামধাতু প্রয়োগের অনুকরণে তিনি অসংখ্য উদ্ভট নামধাতু সৃষ্টি করেছেন। বরদাস্তিতে, ভোঁতাইতে, শীতলিয়া, পরাস্তিব, কাশাইল, হাঁচাইল এমন অগুণতি শব্দ দ্বারা এর কলেবর রচিত হয়েছে। গোটা কাব্যটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, মাইকেলী ঢঙ ও মেজাজ এতটুকুও ক্ষুন্ন হয় নি। তাই মধুসূদনের প্রতি ঋণ স্বীকারও করেছেন অকুণ্ঠ চিত্তে—

মধু ভাষে, মধু হাসে মধুময় সব
এ হেন মধুর পদ বিন্যাসিতে কভু
নাহি লিখিয়াছি। মূঢ় বুদ্ধি আমি, কিসে
বর্ণনিব ভারত-উদ্ধার-বারতা ?
কবিগুরু পদাশ্রয় ব্যতীত বিফল
হইবে প্রয়াস, ভয়ে হতেছি বিহ্বল।
তাই ধ্যানি সকরুণে, কবিগুরু আমি,
কিন্তু সে কি কবিগুরু, যার ধ্যান করি ?
নহে সে বাল্মীকি, নহে পৌরাণিক কেহ
সমিল পদসূদন শ্রীমধুসূদন।
মৃত, তবু শ্রী যাহার না যাইবে কভু,
নহে ও এ কবিগুরু, নহে হেমচন্দ্র
নবীন, প্রবীন, কিংবা কেহই সে নহে।

ভারত উদ্ধারের বিষয়বস্তু ; অন্তঃসারশূন্য দেশ প্রেমিকদের চরিত্র উদ্ঘাটন, তাদের ভীরুতা, স্বার্থপরতা এবং লোক দেখানো দেশপ্রীতির অগভীরতা এই কাব্যে সমুচ্চারিত। যেহেতু ইংরেজী শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের পরিবর্তে স্বজাতীয় এবং স্বধর্মীয়দের প্রকৃত প্রকাশই এই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাই আদর্শের আন্তরিকতা ও ভাবের নিরবচ্ছিন্নতায় এর স্বাদুতা কোথাও উৎকটভাবে পীড়িত হয়নি কিংবা রসিকতার ঔচিত্য কোথাও লঙ্ঘিত হয় নি।

ব্যঙ্গ কৌতুকের এক স্নিগ্ধ রেশ, আদর্শবোধে অভিস্নাত একটা মানসিক প্রশান্তি কাব্যপাঠের পর আমাদের আপ্লুত করে রাখে।

মধুসূদনের অনুকরণেই ইন্দ্রনাথ বন্দনা করেন কাব্যদেবীকে,

'গাও মাতঃ সুররমে বাণী বিধায়িনী
কমল আসনে বসি বীণা করি করে।
কেমনে ইংরেজ অরি দুরন্ত বাঙালী
ত্যজিয়া বিলাসভোগ চাকুরীর মায়া,
টানা পাখা, বাঁধা হুঁকা; তাকিয়ায় ঠেস
উৎসৃজি সে মহাব্রতে।............
....
বন্দি ভারত কবি মুনি বাল্মীকির
প্রেতাত্মার প্রেতপদে করি নমস্কার,
অথবা প্রাচীন গ্রীসে, নগরে নগরে
ঘুরি, যত গোরস্থান নিষ্কাশিত করি
তোমার কঙ্কালে আমি সেলাম ঠুকিয়া
গীতাইয়া লইতাম ভারত-উদ্ধার—'

......নায়ক বিপিনচন্দ্র দেশোদ্ধারের নিমিত্ত যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত তা সম্ভব নয়। স্ত্রীর অনুমতি প্রার্থনা করল বিপিন। স্ত্রী সম্মতি দিল এই বলে,

নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়বল্লভ
নিতান্ত দাসীর কথা না রাখিবে যদি,
(ফুকারি কান্দিয়া এবে উঠিলা বিপিন)
আলুভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে। বিপিন সম্মত।

এই হাসিপরিহাসের মধ্য দিয়ে তৎকালীন স্বাদেশিকতার একটি উজ্জ্বল ব্যঙ্গ-ছবি উপহার পেয়েছি আমরা! ইংরাজ ও বাঙালীর যুদ্ধ বর্ণনা—

অলাবুর প্রহরণে সাজিয়া আবার
গদাযুদ্ধে অগ্রসর হইল ইংরেজ।

ইংরেজ বাঙালী পুনঃ আরম্ভিল রণ
নির্ভীক বাঙালী বীর বঁটি ধরি করে
কচ্ কচ্ লাউ কাটি করে খানখান।
অলাবু প্রহারে কিন্তু বিষম আহবে
অস্থির বাঙালী সৈন্য তিষ্ঠিবারে নারে,
পড়িল সৈনিক বহু। দেখি মিত্রক্ষয়
সারি দিয়া দাঁড়াইয়া বঙ্গ বিলাসিনী
নয়নে অজস্র অশ্রু বর্ষিতে লাগিল
অরাতি বদন লক্ষি। অসংখ্য ইংরেজ
পপাত সে ভূমিতলে, মমার চ বহু
রণে ভঙ্গ দিল যারা ছিল অবশেষ
মাগিলা জীবন-ভিক্ষা বিনয়ে কাতরে।'

যুদ্ধ তো দূরের কথা, নিজের বন্ধুকে পুলিশ বেশে দেখেই বিপিনচন্দ্র পলায়মান। কিন্তু স্বাদেশিকতার জন্য আয়োজিত সভায় তার আস্ফালন,

ভীমবেগে কটিতটে কোঁচার কাপড়
জড়ায়ে বিপিনচন্দ্র ; সমবেদনায়
সকলেই নিজ নিজ কাপড় কষিল।'

পরিহাস প্রলেপিত এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কোথাও গতি হারায়নি, উচ্ছল তরঙ্গ ভঙ্গে লীলায়িত। এর বাইরে বিবেক ও চেতনা জাগানোর যে প্রয়াস সেটা অতিরিক্ত ; নিছক সাহিত্য রসাস্বাদন কোথাও বিঘ্নিত হয়নি। ইন্দ্রনাথ যখন বলেন,

তাড়াতাড়ি স্নান করি বঙ্গ বীরবৃন্দ
নাকে মুখে গুঁজিলাম ভাতে ভাত দুটো,
কাঁপিতে কাঁপিতে হায় আশ্বিনে যেমতি
শারদীয়া মহোৎসবে অষ্টমী তিথিতে,
পূজার প্রাঙ্গনে পাঠা বদ্ধ যূপকাষ্ঠে
বিল্বপত্র চর্বে, যবে ছেদক আসিতে
বিলম্ব করয়ে কিছু, অথবা যেমন
মার্গশীর্ষে পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে।

তখন আমাদের জাতিগত প্রবণতা বা দুর্বলতা বিশেষভাবেই প্রতিভাত হয়। এমন অজস্র বিচিত্র উপমা ও চিত্রকল্পের সাহায্যে ভারত-উদ্ধার প্যারডির সৃষ্টি হয়েছে।

পাঁচু ঠাকুরের নক্শা ও বিভিন্ন চুটকীর মধ্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মজলিসী প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। তবে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের কোন বিরাম নেই। 'মান' নকশায় মানী লোকদের প্রতি তাঁর আবেদন, "ধোপাকে ভার দিও। সে দুটি পয়সায় তোমার সঙ্গ দোষ, চরিত্র দোষ সকল দোষ ধুইয়া দিয়া তোমার পুরাতন মান ইস্তিরীর জোরে খাড়া করিয়া দিবে। তোমার সেই নিখুঁত, নিভাঁজ নির্মল মান লইয়া তুমি চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া, চোখ রাঙাইয়া, বুক ফুলাইয়া চলিয়া যাইবে। মান তো ধোপার হাতে আর ধোপা দু'পয়সার চাকর। মানের জন্য আবার ভাবনা।"

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে স্বভাবতই সেই সময়ের আরো দুজন সাহিত্যিকের কথা মনে আসে। যোগীন্দ্রনাথ বসু এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। এঁরাও হাসির মাধ্যমে সমাজের করুণ ও অমানবিক দিকগুলি তুলে ধরতে চেয়েছেন। তবে জাতে এক হলেও এই তিনজনের গোত্র আলাদা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "ইন্দ্রনাথের শ্লেষ প্রধানত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সামাজিক অপদার্থের দল এবং ব্রিটিশ শাসনের দিকে ধাবিত হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথ হিন্দু রক্ষণশীলতার প্রতিনিধি, আধুনিক শিক্ষা, বিদুষী নারী এবং ব্রাহ্ম সমাজ তাঁর ব্যঙ্গের উৎস—তাঁর রুচিও অভিনন্দনীয় নয়। ত্রৈলোক্যনাথের সমালোচ্য প্রধানত গ্রামীণ সমাজ, আত্মশুদ্ধিই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। যোগীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়াধর্মী মনোভঙ্গি তাঁর মধ্যে খুব বেশী দেখা যায় না। ইন্দ্রনাথ হিন্দু জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন রুচির শুচিতাও তাঁর সর্বত্র অব্যাহত থাকেনি।...অপর দুজন সাহিত্যকে প্রচারের বাহন করেছিলেন, ত্রৈলোক্যনাথের প্রচারণা তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে সুকৌশলে বিন্যস্ত।" যোগীন্দ্রনাথ মূলত ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজকে কালিমামুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সেই জন্য তাঁর উপন্যাস উগ্র প্রচারধর্মী। 'শ্রীশ্রী রাজলক্ষ্মী', 'চিনিবাস চরিত্র' প্রভৃতিতে উপন্যাসের উপাদান প্রচুর থাকা সত্ত্বেও সার্থক রসসৃষ্টি হয়নি এই উগ্র একপেশে প্রচারধর্মিতার জন্য। ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ এমন মাত্রাতিরিক্ত যে নির্মল হাস্যরসের ধারা অপ্রতিহত থাকে না। অবশ্য ত্রৈলোক্যনাথের অভিজ্ঞতা ও

রচনার পরিধি অনেক ব্যাপক ও গভীর, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ ও সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের সঙ্গে নিবিড় মেলামেশার ফলে তিনি সমাজের যে রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, উঁচুতলার প্রতিষ্ঠিত মানী ব্যক্তিদের মধ্যে যে ভণ্ডামী ও নীচতা লক্ষ্য করেছিলেন তাই নানা রূপক ও রসিকতার মাধ্যমে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। আপাতদৃষ্টে লঘুতা ভেদ করে এক স্থায়ী বেদনা ও সহানুভূতিতে আমাদের মন ভরিয়ে দেয়, চিন্তার খোরাক এনে দেয়। বৈঠকী মেজাজে বলা তাঁর মুক্তামালা, মজার গল্প, ডমরু চরিত বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ, আজও অম্লান, দীপ্তিময়। কিন্তু ইন্দ্রনাথের মধ্যে শুধু ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ, উদ্দাম রসিকতা আর উচ্ছল হাস্যরস। হয়ত অনেক সময় তাঁর রচনা ভাঁড়ামোর পর্যায়ে এসে যায় কিন্তু তা নিয়ে কোন চিন্তা বা মাথাব্যথা তাঁর নেই। পাঠশেষে বিশেষ কোন চিন্তার উদ্রেক করে না, অশ্রুর আমদানি হয় না বা কোন জ্বালারও সৃষ্টি করে না।

ব্যক্তিগত জীবনে ইন্দ্রনাথ বন্ধুদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টায় মশগুল থাকতেন, তাঁর সরস ও সটিক উক্তির মধ্যে এমন একটা বিদ্যুৎস্পর্শ নিহিত থাকত যার ফলে বন্ধু ও স্বজনদের কাছে তাঁর সান্নিধ্যলাভ ছিল বহু আকাঙ্খিত। জীবন ও জগৎ, সমাজ ও পরিবেশকে সব সময় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে, তামাশা ঠাট্টা করে মজা পেতেন। সমসাময়িক রাজনীতি, আইন আদালত, ইলবার্ট বিল, কংগ্রেসের কার্যকলাপ, সুরেন্দ্রনাথের আন্দোলন ও বক্তৃতা কোন কিছুই রেহাই পায়নি তাঁর লেখনীর কশাঘাত থেকে। এক সময় তিনি নিজেই উপলব্ধি করেছিলেন যে জীবন ও জগতের প্রতি এই বক্র তির্যক দৃষ্টি, সব কিছুকে নিয়ে ব্যঙ্গ পরিহাসের প্রবণতা তাঁকে সব ভালো ও সুন্দরের প্রতি বিরূপ ও বিমুখ করে তুলেছে। 'আমার বিদেশী আমদানী Satire আমার জীবনের মাধুরীর সঙ্গে শুকাইয়া গিয়াছে।' এই উক্তির মধ্যে হতাশার রেশ থাকলেও Satire ইন্দ্রনাথের শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গেই জড়িত ছিল। প্রথম জীবন থেকেই এর চর্চা ও অনুশীলন হয়েছিল এর বাইরে যাবার উপায় ছিল না। ইচ্ছে থাকলেও সম্ভব ছিল না। বুদ্ধিমান রসিক ইন্দ্রনাথ জানতেন তাঁর রচনার সাময়িক মূল্য থাকলেও কালের বিচারে তার স্থায়িত্ব বেশীদিন নয়। তবু প্রেরণা আর অভ্যাসের বশেই এই Satireকেই তিনি মূলমন্ত্র করে নিয়েছিলেন।

ইংরেজ সমালোচক Satire-এর স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন, 'Satire is a

very delicate operation and no man will trust himself with it except he be in possesion of a thorough training, a clear purpose and a sound knowledge of moral anatomy,' ইন্দ্রনাথের মধ্যে thorough training, clear purpose এবং sound knowledge of moral anatomy কোনটিরই ঘাটতি ছিল না, বলাই বাহুল্য।

তাঁর রচনায় Wit or Humour বিশেষ নেই। আর সে সবের জন্য উদ্‌গ্রীবও ছিলেন না, কারণ বুদ্ধিদীপ্ত ও বৈদগ্ধ্যপূর্ণ বাক্যের সমারোহ, কিংবা জীবনের অসংগতি ও অপূর্ণতার প্রতি মমত্বভরা অশ্রুসজল দৃষ্টিপাত তাঁর আলোচ্য ও উপজীব্য বিষয়াবলীর বহির্ভূত ছিল। তবে Wit বা Humour থাক বা না থাক, Satire এবং fun রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। আবার শুধুই উদ্দেশ্যহীন উদ্দাম কৌতুকরস সৃষ্টির দিকেও তাঁর মানসিক প্রবণতা ছিল না। তবে Satire মাঝে মাঝে এমন অসংগত, মাত্রাহীন ও ঔচিত্যরহিত হয়ে পড়েছিল যে লোক হাসাতে অনেক সময় হয়ত নিজেই হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছেন।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সর্বপ্রকার বাধা ও বিপত্তির হাত থেকে রক্ষা করার যে ব্রত ও সাধনা ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন হেমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল কাব্য, নাটক ও প্রহসনের ধারা বেয়ে। আর কথাসাহিত্যে সেই আদর্শের অনুসরণে ব্যংগ কৌতুককে হাতিয়ার যাঁরা করেছিলেন ইন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম, উজ্জ্বলতমও বটে।

বিগত দিনের কৃতী ব্যক্তিদের মূল্যায়নে যদি আমরা সেই সময়ের প্রেক্ষাপট বিস্মৃত হই, তবে বিচারের পরিবর্তে অবিচার হবারই সম্ভাবনা বেশী। শুধু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই নন, সেই যুগের অনেক মনীষী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য। ফল কথা, ইন্দ্রনাথ সে যুগে যে চমক সৃষ্টি করেছিলেন, যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য আজ অনস্বীকার্য এবং প্রাসঙ্গিকতা হারালেও তাঁর সৃষ্টি থেকে বিশুদ্ধ সাহিত্যের রসাস্বাদনও একেবারে দুর্লভ নয় বলেই তাঁর হাস্যকৌতুক সেদিনের উদ্দাম হাসির ফোয়ারা না আনলেও একটা প্রসন্ন স্মিতভাব মনে সঞ্চার করে অনিবার্যভাবেই। পথিকৃৎ হিসাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান তো তাঁর প্রাপ্যই আর তাৎক্ষণিকতার উর্ধে চিরন্তন রসসৃষ্টির যদি কিছু সাক্ষাৎ ঘটে সেটাই আমাদের পরম প্রাপ্তি।

ডঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪)

মাত্র কয়েক বছর আগে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু তা নিয়ে সাহিত্যমোদী বা বিদগ্ধ সমাজে বিশেষ কোন তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় নি। তৎপরতা অর্থে নরেশ চন্দ্রের লেখা, তাঁর অবদান বা বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকা এসব নিয়ে কোন তথ্যবহুল আলোচনা হয় নি। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা এখানে সেখানে হয়েছে বটে কিন্তু তা যেন অনেকটা দায়সারা গোছের। দুটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে যাঁর লেখা প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, বিগত শতাব্দীর উন্নত নীতিশাসিত জীবনবোধে সুস্থিত বাঙালী পাঠক এক অনাস্বাদিত রসের সন্ধান পেয়েছিল যাঁর রচনায়, সেই নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মাত্র কয়েক বছরের অতিক্রান্তিতেই বিস্মৃত ও অনাদৃত হয়ে যাবেন, এটা খুবই বেদনার। আমাদের সংস্কৃতি-চেতনা ও ইতিহাসপ্রীতির পক্ষে এটা খুবই লজ্জাকর সন্দেহ নেই। হয়ত কদাচিৎ কখনো বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনায় বা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠের সময় তাঁর নাম উচ্চারিত হয়। তবে মনে হয় এরও মেয়াদ হয়ত বেশী দিন থাকবে না। শতবর্ষ পূর্তিতে যে সামান্য শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত হয়েছিল তাতেই হয়ত অন্যতম পুরোধা এই সাহিত্যিকের প্রতি শেষ আরতির শিখা প্রজ্বলিত হয়েছিল। অবশ্যই গবেষক ও সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের ঔৎসুক্য মেটাতে তাঁর লেখা পঠিত, আলোচিত ও পুনর্মূল্যায়িত হবে কিন্তু তা হবে সাধারণ সাহিত্য পাঠক ও রসিকদের চৌহদ্দির বাইরে। অথচ তাঁর সময়ে যে অজস্র লেখা তিনি লিখেছেন—গল্প, উপন্যাস, রহস্য কাহিনী, প্রবন্ধাবলী—শরৎচন্দ্রের সর্বপ্লাবী জনপ্রিয়তার মধ্যেও সে সবের পাঠক সংখ্যা ছিল অগণিত।

তাঁর রচনা যেমন বহুবিস্তৃত, কর্মজীবনও বহুধাব্যাপৃত। বাংলাদেশের টাঙ্গাইলে তাঁর জন্ম ১৮৮২ সালে। এম. এ. পাশ করার পর ডক্টরেট অফ ল হন ১৯১৪ সালে। অধ্যাপনা করেন রিপন কলেজ, সিটি কলেজ, কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর ঢাকা আইন কলেজে সহ-অধ্যক্ষের পদে আসীন হন ১৯১৭ সালে। আইন ব্যবসায়েও প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

১৯৫০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অলংকৃত করেন ঠাকুর অধ্যাপকের পদ। আইন বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল যার ফলে ১৯৫৬ সালে তিনি ভারতীয় আইন কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর আগে ১৯৫১ তে ইউনেসকোর আমন্ত্রণে আমেরিকায় ঘুরে এসেছিলেন। তাঁর বৈচিত্র্য-পূর্ণ কর্মজীবনের মধ্যে রয়েছে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস্ পার্টির সভাপতির পদ গ্রহণ (১৯২৫-২৬) এবং লেবার পার্টি অফ ইন্ডিয়ারও সভাপতি হয়েছিলেন ১৯৩৪ সালে। সাহিত্যে নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাত্রাবস্থাতেই শুরু হয়েছিল যার জন্য ১৯১৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্রাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৩৫ এ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতিও ছিলেন তিনি।

নরেশচন্দ্রের রচনা অসংখ্য। অগ্নিসংস্কার, দ্বিতীয় পক্ষ, পাপের ছাপ, কাঁটার ফুল, শাস্তি, গ্রামের কথা, বিপর্যয়, ব্যবধান, রাজসী, পিতাপুত্র, মিলন পূর্ণিমা, দূরের আলো, তৃপ্তি, সতী, একা, রূপের অভিশাপ, তাবিজ, দুষ্টগ্রহ, লক্ষ্মীছাড়া, সর্বহারা, ব্রতী, লুপ্তশিখা, অভয়ের বিয়ে, শুভা, তারপর, অন্তরায়, ঠকের মেলা, নারায়ণী, আনন্দ মন্দির, তরুণী ভার্যা, ভুলের ফসল, খেয়ালের খেসারত, এমন আরো অসংখ্য গল্প, উপন্যাস। ইংরেজীতে লিখেছেন Evolution of law, Basis of self rule in India, Sources of law and Society in Ancient India, The Abbey of Bliss (আনন্দমঠের অনুবাদ)। সম্পাদনা করেছেন পল্লীস্বরাজ ও বাসন্তিকা ইত্যাদি।

উল্লিখিত রচনারাজির বাইরেও তাঁর অনেক গল্প উপন্যাস রয়েছে যা বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যে বিস্ময়কর। যখন যা মনে এসেছে তাই অনর্গল লিখেছেন, কাহিনীর বিস্তারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, ঘটনার বিশ্বাসযোগ্যতা বা চরিত্রসমূহের বাস্তবতার কথা বিশেব চিন্তা করেন নি। অপরাধমূলক আর যৌন ঘটনাসম্বলিত রচনাগুলি পাঠক মহলে অভাবনীয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। বঙ্কিম, রবীন্দ্র ও শরৎ রচনার বাইরে এক অতি তরলিত সুপাঠ্য রসের সন্ধান পেয়েছিলেন বাঙালী পাঠক। কিন্তু জীবননিষ্ঠ প্রত্যয়বোধের অভাবে, ঐশ্বর্যমণ্ডিত কল্পনার অনুপস্থিতি সে সব রচনার আকর্ষণ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আজ স্মৃতি থেকে প্রায় অবলুপ্ত।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা 'ঠানদি' গল্প, যা রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত। প্লট সেই এক। স্বামী, স্ত্রী এবং এক দেবর।

স্বামীর অনিচ্ছাকৃত ঔদাসীন্যের বা স্ত্রীর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগের অভাবের রন্ধ্রপথ দিয়ে দেখা দেয় দেবরের প্রতি স্ত্রীর অদম্য আকর্ষণ। তবে সমস্ত ঘটনার যথাযথ ও সুসংহত বিন্যাসের মধ্য দিয়ে নষ্টনীড়ে যে স্বাভাবিক পরিণতি আমরা লক্ষ্য করি, ঠানদি গল্পে তা অনুপস্থিত। অমলকে বাইরে পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত রুচি ও নীতিকে আহত হতে দেন নি। অমলের প্রতি চারু যেভাবে ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হয়েছিল তার যুক্তিসিদ্ধ একটা কারণ পেতে আমাদের অসুবিধা হয় না। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের সংযম ও ভাষা কখনো নীতি ও ঔচিত্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় নি। একটা বেদনা আমাদের মনে জাগে কিন্তু কোন ক্লিষ্টতা তিক্ততার সৃষ্টি করে না, চারু-অমল-ভূপতি সকলের জন্যই সমবেদনা জন্মে।

ঠানদি গল্পে যেন লেখক এই সব নীতি রীতি অনুশাসন সব কিছুর সীমানা অতিক্রমনের নেশায় মেতেছিলেন এবং এই প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে পরবর্তী অনেক লেখায়। স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে ঠানদি দূর সম্পর্কের দেবর শচীকান্তর প্রতি দৈহিক আকর্ষণ অনুভব করেছেন। মৃত্যুর পরে দেবরের উদ্দেশ্যে বলতে শোনা যায়, শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমি যেন তোমাকে সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে ভাল না বেসে আমার সমস্ত জীবন দিয়ে তোমাকে আকাঙ্ক্ষা না করে পারিনি। তোমাকে দেখলে আমার লোভ হয়। একদিন নির্ণিমেষ নয়নে শচীকান্ত যখন তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল তখন ঠানদির অকপট স্বীকারোক্তি, মিথ্যা কহিব না, শচীর চোখের ভাষা আমি বুঝিয়াছিলাম, তাহাতে আমার রাগ করাই উচিত ছিস, কিন্তু আমি পোড়ারমুখী। তাহার উপর আমার রাগ হইল না, লজ্জা পাইয়া আমি তাহার পিপাসা বাড়াইয়া দিলাম, হয়ত বা আশ্বাস দিলাম।

১৯১৮ সালে উপন্যাসের মধ্যে দেবর বৌদির এই সম্পর্কের সোচ্চার সংলাপ ও প্রকাশ বাঙালী মানসিকতায় অচিন্ত্যনীয় ছিল। গল্পের কোথাও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোন বিরোধাভাস বা অসন্তোষের ইঙ্গিত ছিল না। শুধু স্বামীর দীর্ঘ অনবকাশের ফলে তার স্থানে দেবরকে বসানো হল—এটা আমাদের নীতিবোধে যথেষ্ট আঘাত করে, যতই বাস্তব হোক না কেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটা মাত্রাতি-ক্রমণ, কুরুচির পরিচায়কও বটে। নষ্টনীড়ে যে চারিত্রিক বন্ধন ও শুচিতা অমল, ভূপতি ও চারুর মধ্যে দেখা যায়, ঘটনার ক্রমিক অনুপুঙ্খ বর্ণনায় যে

বিশ্বাসযোগ্যতা ও স্বাভাবিকত্ব রয়েছে ঠানদিতে সে সবের একান্ত অভাব। তাছাড়া একটি বিধিবহির্ভূত, সমাজ অননুমোদিত কাহিনী রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে আভিজাতিক পরিমিতি বজায় রেখেছেন নরেশচন্দ্র যেন অনেকটা ইচ্ছে করেই তা লঙ্ঘন করেছেন। ভাবটা যেন, নষ্টনীড় গল্পের যে অপূর্ণতা, অনুচ্চার ব্যঞ্জনা তাকেই পূর্ণতা প্রদান করেছেন অতি সজ্ঞানে, সবল ভাবে। এর ফল যা হবার তাই হল। অর্থাৎ কিছু লোকের কাছ থেকে পেলেন নিন্দা ও অপবাদ আর অনেকে এই দুঃসাহসিকতার জন্য তাঁকে জানালেন অভিনন্দন।

এরপর শুভা উপন্যাসে তিনি অনেক রীতি বিগর্হিত প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন। স্বামীর গৃহ পরিত্যাগের মধ্য দিয়ে শুভার স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ লক্ষণীয়। জীবিকার জন্য তাকে নাটকের দলে ভিড়তে হল কিন্তু মনের অদম্য প্রণয় পিপাসাকে রুদ্ধ করতে পারেনি। এবং নতুন করে ভালবাসার যে মোহ তা ভাঙ্গার সঙ্গেই নিজেকে সঁপে দিল সমাজসেবার কর্মযজ্ঞে। একের পর এক ঘটনা শুভাকে নিয়ে গেল বহু বিচিত্র কর্মস্রোতে কিন্তু যার জন্য যাওয়া, সেই ব্যক্তিস্বাধীনতা স্ফুরণের মধ্য দিয়ে চরিতার্থতা লাভ করা, তা আর হয়ে ওঠেনি। সার্থক উপন্যাসের সব লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও শুভা পরিপূর্ণতা পায়নি এর অসংলগ্নতা ও পারম্পর্যের অভাবে।

এর পর শুরু হল রচনার অজস্রধারা। নরনারীর দেহগত কামনা পরিস্ফুটনে আরো বেপরোয়া লেখা 'দগ্ধগিন্নী', 'যোগী' এবং এই ধরণের নানা গল্প। 'দেহের অনুতে রক্তের কোষে যে কামনার বীজ, নিষিদ্ধ প্রেমে অবগাহনে মানুষের স্বাভাবিক আসক্তি, পরকীয়া সংসর্গে যে দুর্মদ অভীপ্সা' সেই সব চিত্রণে তিনি এত অক্লান্ত উদ্দাম হয়ে উঠলেন সে অশ্লীলতা আমদানির দায়ে তাঁকে অভিযুক্ত হতে হল অনতিবিলম্বে। একদিকে তরুণ মানসিকতার কাছে হলেন আরাধ্য এবং অনুকরণীয় আর রক্ষণশীল বিদগ্ধ সমাজের দ্বারা নিন্দিত ও ভর্ৎসিত। সজনী-কান্ত দাস সাহিত্যে অশ্লীলতা ও দুর্নীতি প্রবর্তনের অভিযোগে যাঁদের আসামী করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের দরবারে নরেশচন্দ্রের নাম ছিল সেই তালিকার পুরোভাগে। সাহিত্যের রীতি প্রকৃতি, লক্ষ্য, আদর্শ, উদ্দেশ্য এসব নিয়ে আরম্ভ হল প্রচন্ড বাদ প্রতিবাদ। তর্কাপ্লুত এই প্রাঙ্গন থেকে রবীন্দ্রনাথও নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি। তাই তাঁর লেখনী থেকে নির্গত হল, 'সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকে

এখানকার কেউ কেউ মনে করছেন নিত্যপদার্থ : ভুলে যান যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটাই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানসম্মত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, আব্রুটা দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতা আর্টের পৌরুষ।' রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে কারও নাম উল্লেখ না করলেও বুঝতে অসুবিধা হয়না যে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল নরেশচন্দ্র। সাহিত্য নিয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়া রবীন্দ্রনাথের স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু সজনীকান্ত এবং অনেক রবীন্দ্রানুরাগী মনে করলেন কবির নীরব থাকাটা হবে এই সব দুর্নীতি ও ভ্রষ্টতাকে প্রশ্রয় দেওয়া। তাই অনেকটা অনুরাগীদের প্ররোচনায় এবং কিছুটা আন্তর তাগিদে তিনি এ সম্বন্ধে কলম ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কিন্তু বৈপ্লবিক ভাবনায় উজ্জীবিত, দুঃসাহসিকতায় মোহগ্রস্ত নরেশ সেনগুপ্ত এতে বিন্দুমাত্র না দমে লিখলেন 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা'; সেখানে তিনি সোচ্চার এই বলে, "নূতনের সাড়া পাইলেই স্থিতিস্থাপক জনসমাজে একটা প্রচণ্ড কোলাহলের আবির্ভাব হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে।....এই আক্রমণকারীদের রথের উপরে আজ এমন একজন আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন যাঁহাকে দেখিয়া নব্য সাহিত্য চমকিত হইয়া চক্ষু বারবার মাজিয়া অবাক বিস্ময়ে চাহিতেছে। তিনি আরও অগ্রসর হয়ে লিখলেন, "যৌন সম্বন্ধে আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে আজ পর্যন্ত সকল সাহিত্যেই অল্পবিস্তর হইয়াছে। হয়ত সবচেয়ে বেশী হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের বিরাট গ্রন্থাবলীতে। সাহিত্যের বে-আব্রুতা সম্বন্ধেও কোন নিত্য বা সনাতন মাপকাঠি নাই, এমন কিছুই নাই যাহার দ্বারা আব্রুতা ও বে-আব্রুতার মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট সীমারেখা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। চোখের বালির অনেকগুলি দৃশ্য অনেকের মতে অতিরিক্ত বে-আব্রু। 'ঘরে বাইরে'র অনেকটা তো বটেই। অথচ আমরা তা মনে করি না। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত বা চরিত্রহীন কি বে-আব্রুতার অন্তর্ভুক্ত? এ বিষয়ে কবিবর আমাদের কোন স্পষ্ট নির্দেশ দেন নাই। শারীর ব্যাপার মাত্রেই তো অপাংক্তেয় নয়, কেন না চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাকা করিয়া দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল সাহিত্যসম্রাট। আলিঙ্গনও চলিয়া গিয়াছে। তাছাড়া 'হৃদয় যমুনা,' 'স্তন', বিজয়িনী—বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দৈহিক ব্যাপার লইয়া অপূর্ব রস উদ্ঘাটন করিয়াছেন।" এই সাহিত্যকে বিলাতের আমদানি বলে যে অভিযোগ করা হয়েছিল, নরেশচন্দ্র তার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'এই সাহিত্যের

মধ্যে অনেক কিছুই আছে যা দেশের জীবন ও সমাজের রসমূর্তি'।' সাহিত্যের এই বিতর্কে তখন অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। যেহেতু সাহিত্য চিরদিনই সচল ও সপ্রাণ তাই বোধহয় কোন নির্দিষ্ট ছকে বা সূত্রে তাকে আবদ্ধ করা যায় না। এক সময় বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেক বিরূপতা, সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল তাঁর সময়ে নীতিহীনতার জন্য এবং পরবর্তী-কালে অতিরিক্ত রক্ষণশীলতার জন্য। আর রবীন্দ্রনাথের তো কথাই নেই। বোধ হয় সারা জীবন ধরেই নানা ভাবে, নূতনতর দৃষ্টিতে তিনি বিরোধীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। সুতরাং নরেশচন্দ্র অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং তরুণ, আর যেহেতু তাঁর উদ্যোগ ও প্রয়াস অনেকটা বেপরোয়া ও দুঃসাহসিক, তাই তাঁর লেখা নিয়ে যে ঝড় উঠবে এটাই তো স্বাভাবিক।

সাহিত্যে নীতি ও শুচিতা নিয়ে এই বাদানুবাদে বেশী দিন জড়িত থাকা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই সাময়িক উত্তেজনা ও বিরক্তি প্রশমিত হলে পর নিজেকে সরিয়ে নিলেন স্ব-ক্ষেত্রে স্ব-ভাবনায়। শরৎচন্দ্র এ বিষয়ে নরেশচন্দ্রকে সমর্থন করলেও প্রকাশ্য তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চাননি। তবে বহু আলোচনা ও পত্রগুচ্ছে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নরেশচন্দ্রকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। অশ্লীলতা ও দুর্নীতির দায়ে এক সময় শরৎচন্দ্রকেও অভিযুক্ত করা হয়েছিল। সংস্কৃতির মান ও সাহিত্যের শুচিতা তিনি কলুষিত করেছেন এ ধরণের অপবাদ ও অভিযোগ তাঁকেও প্রচুর শুনতে হয়েছিল। তাই শরৎ-চন্দ্রের সহানুভূতি ও মানসিক প্রবণতা যে এই সব তরুণদের প্রতি থাকবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এই বাদানুবাদে এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি আক্রমণে রবীন্দ্র ভক্তবৃন্দ স্বভাবতই ক্ষুব্ধ ও ক্ষুন্ন হয়েছিলেন এবং বহু শ্লেষ ও কটূক্তি নরেশচন্দ্র এবং সমমনোভাবাপন্ন লেখকদের সইতে হয়েছিল। অবশ্য নলিনীকান্ত গুপ্তের মত বিদগ্ধ ব্যক্তি সাহিত্যের এই নতুন জোয়ার ও লক্ষণকে কৃত্রিম ও অপরিণত বলে মন্তব্য করেও স্বীকার করেছেন, 'আজ যাহারা বঙ্গরাণীর জন্য নৈবেদ্য আহরণ করিতে গিয়া পাতাল রসাতল ঢুঁড়িতেছেন, তাঁহারা সকলেই যে স্রষ্টা হিসাবে অক্ষম বা অপটু তাহা নহে।' বস্তুতঃ গোলমালের শুরু এইখানেই। যদি এক কথায় এই সব লেখাকে নস্যাৎ করে দেওয়া যেত তবে সব ঝামেলারই অবসান হত। প্রচলিত রুচিকে, চিরাচরিত বদ্ধমূল ধারণাকে আঘাত করতে পেরেছিল বলেই অনেককে আকৃষ্ট করেছিল এই নতুন লেখকদের গল্প উপন্যাস

তা যতই অপরিণত বা অস্ফুট হোক না কেন। শুধু অশ্লীলতা দেখানো, শুধু দুর্গন্ধ ছড়ানোই যদি এঁদের একমাত্র কাম্য বা অভীষ্ট হত তবে দুদিনেই পাঠকেরা এই সব সৃষ্টির থেকে মন সরিয়ে নিতেন। কিন্তু হয়ত কোথাও কোন সত্য, কোন বাস্তবতা এই সবের মধ্যে ছিল তাই একটা সন্দেহ সংশয় সব সময়ই দেখা দিতে লাগল, না পরিপূর্ণ গ্রহণ, না সম্পূর্ণ বর্জন। স্রষ্টা হিসাবে এঁরা অক্ষম বা অপটু নয় বলেই আরো অস্বস্তির কারণ।

নরেশচন্দ্র অক্ষম বা অপটু তো ছিলেনই না, বরং একটি বিশেষ দিকে অতিরিক্ত পটুতাই তাঁর ছিল। সেই পটুতা গভীরতার অভাবে অবিন্যস্ত প্রকাশে এবং অস্বচ্ছ দৃষ্টির প্রভাবে সার্থকতার স্তরে উন্নীত হতে পারে নি। অপরাধতত্ত্ব ও যৌনবিজ্ঞানের অতিমন্থন ও অতিকথন সত্ত্বেও যদি শৈল্পিক সুষমা ও বাকসংযম থাকত তবে তাঁর অনেক রচনাই সাময়িকতা ছাড়িয়ে কালের নির্মম গ্রাস থেকে অব্যাহতি পেত। তিনি নিজেও এ সম্বন্ধে, তাঁর এই উদ্দাম বে-পরোয়া মানসিকতা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, কারণ 'আমার কোন গল্পই গ্রীক পুরাণের মিনার্ভার মত বর্মে-চর্মে পূর্ণাঙ্গ হয়ে আমার মনে আকারিত হয় না। একটা ছোট ঘটনা বা অবস্থার কথা আমার মাথায় এসে তা লতা-পল্লবিত হয়ে হয়ে ক্রমে লেখার যোগ্য আকার ধারণ করে। এই যে লতা-পল্লব, তাও প্রায় মনে মনে ধ্যান করে জন্মায় না, জন্মায় বেশির ভাগ কলমের ডগায়। গোড়ার কথাটা মনের ভিতর আকারিত হলেই আমি কলম নিয়ে বসি, তারপর কলম চলতে চলতে কথা. চিত্র ও চরিত্র আমার মাথার চারপাশে ভিড় করে এসে কলমের মুখে আত্মপ্রকাশ করে।' নিজের ক্ষমতা এবং দুর্বলতা, সাধ ও সাধ্য সম্পর্কে এই মূল্যায়ন সঠিক এবং যথার্থ, কারণ তাঁর অধিকাংশ রচনাতে সাময়িক উত্তেজনার প্রচুর খোরাক থাকলেও দীর্ঘস্থায়ী রেশ বা আবেদন খুবই অলভ্য। ঘটনার বিস্তার, চরিত্র সৃষ্টি এমন কি ভাষার বন্ধনও হয়ে উঠেছে এলোমেলো, অবিন্যস্ত সংগতিহীন। পাত্র পাত্রীর পারিপার্শ্বিকতা, তাদের সামাজিক মর্যাদা এবং কাজ কর্মের ঔচিত্য সম্পর্কে অসতর্ক থেকে তিনি কলমের ডগাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে অজস্র গল্প উপন্যাসের মধ্যে বিপর্যয়, অগ্নিসংস্কার এই রকম আর দু একটি ছাড়া কোনটাই বর্তমানে পাঠক সমাজের নিকট পরিবেশনযোগ্য নয়। কয়েকটি উপন্যাস ছায়াছবিতেও রূপায়িত হয়েছে তবে সে সবের পরিণতি কাহিনী সমূহের মতই। অর্থাৎ জনপ্রিয়তা লাভ

করলেও কোন উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হিসাবে কেউ মনে রাখেনি। অভয়ের বিয়ে, রাজগী, রবীন মাস্টার প্রভৃতি এক সময় যথেষ্ট জনসমাদর পেয়েছিল কিন্তু এ পর্যন্তই। পরবর্তী কালে কখনোও সেগুলির নাম উচ্চারিত হয় না। তাঁর প্রবন্ধাবলীর মধ্যেও রয়েছে প্রচুর সারবত্তা, গভীর পাণ্ডিত্য এবং যুক্তিশীলতা কিন্তু সেখানেও তথ্য ও ভাবাবেগের মাত্রাতিরেক সেগুলিকে প্রবন্ধ সাহিত্যরূপে প্রস্ফুটিত হতে দেয় নি। অসংলগ্নতা এবং ধারাবাহিকতার অভাব অতি প্রকট সেই সব জ্ঞানগর্ভ আলোচনায়।

এই অসংলগ্নতা ও অযৌক্তিকতা বিশেষভাবেই চোখে পড়ে ভুলের ফসল, শান্তি, পাপের পরিণাম প্রভৃতি উপন্যাসে। বিস্ময়াবিষ্ট, হতচকিত হবার মত অনেক সংলাপ ও ঘটনা এ সবে রয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, পাত্র-পাত্রীর বুদ্ধিদীপ্ত অসংকোচ কথাবার্তা ও আচরণ এমন অনেক কিছুই সমাবিষ্ট হয়েছে যা তৎকালীন পাঠকমনে কৌতূহল ও রোমান্সের সঞ্চার করেছিল। কিন্তু অনেকটাই যেন রহস্যরোমাঞ্চ সিরিজের তাৎক্ষণিক আকর্ষণ ও রুদ্ধশ্বাস শিহরণ, যা বিলীন হতেও বেশী সময় লাগেনি। তবে লুপ্তশিখা, অগ্নিসংস্কার এবং বিপর্যয়ে তিনি এই সব দৌর্বল্য অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন, উপন্যাসোচিত গুণাবলী যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে। প্লটের পরিকল্পনা, ঘটনা ও চরিত্রের বিবর্তন, সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনের সমস্যাদি সবই বর্ণিত হয়েছে স্রষ্টার অনপেক্ষতা ও নিরাসক্তির মাধ্যমে, অতর্কিতভাবে কোন উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি আরোপ করা হয়নি। আর হয়নি বলেই উপন্যাসের তালিকায় হয়ত আজও এদের নাম উল্লেখিত হয়।

বিপর্যয় উপন্যাসে দুটি নারী—মনোরমা আর অনীতা। মনোরমা বিধবা, বৈধব্য পালনের কঠোরতা, সংযম, আচার-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন সত্ত্বেও সে যৌবনের দুর্বার আকর্ষণ বোধ করে দেহের অণুতে, রক্তের কণিকায়, যার পরিণতি বিবাহের মধ্যে। আর অনীতা বিলাসবহুল উচ্ছৃংখল জীবনে অভ্যস্তা, ভোগলিপ্সা আর ঐহিক সুখে তার অতিরিক্ত আসক্তি। এই অতিরেকের ফলেই তার মধ্যে এল একটা বৈরাগ্য যার ফলে বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্মে নিজের অতৃপ্ত অশান্ত চিত্তের শান্তি খুঁজে পেল। দুই নারীর দুই বিপরীতধর্মী জীবন সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়ে নিজেদের পরিণতি লাভ করেছে। অসম্ভব ও অবাস্তব ঘটনা আরোপে তাদের স্বভাবধর্মকে ক্ষুন্ন করা হয়নি। তবে ঘাত-প্রতিঘাতের

বাহুল্যে মনোরমা ও অনীতার ব্যক্তিসত্বা আচ্ছাদিত হবার জন্য এদের ব্যক্তিজীবনের সমস্যা সামাজিক সমস্যার অংগীভূত হয়ে গেছে। তাই একটা ব্যথাদীর্ণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কোন ট্রাজিক উপলব্ধি সঞ্চারিত হয় না।

অগ্নিসংস্কার উপন্যাসে সত্যেশ ও ইলা স্বামী স্ত্রী। জীবনযাপন ও দৃষ্টি-ভংগীতে দুজনে ভিন্ন রুচির। শিক্ষা ও সংস্কারগত একটা ব্যবধান তাদের মধ্যে ছিল যা বিয়ের কিছুকাল পরেই প্রকটিত ও তীব্রতর হয়ে উঠল। তৎকালীন ইংগ বংগ সমাজের বিলাসপ্রিয়তা, চটুল রসিকতা, ভোগাসক্তি ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে ইলা নিজেকে চেষ্টা করেও মুক্ত রাখতে পারে নি। আবার নিজের নীতি ও সংস্কারের ক্ষেত্রে সত্যেশ ছিল অনমনীয়, আপোষহীন। ইলার সহজ জীবন-যাত্রা, তার চঞ্চলতা ও উদ্দামতার সে নীরব সাক্ষী হয়েই রইল অভিমানভরে কিন্তু পৌরুষ বা কর্তৃত্ব খাটিয়ে তাকে নিরস্ত কিংবা নিবৃত্ত করতে চায় নি সে, ফলে উভয়ের মধ্যে ধূমায়িত বিরোধ এই পারস্পরিক দূরত্বকে আরও প্রশস্ত ও বিস্তৃত করে আনল। বিচ্ছেদ যখন প্রায় অনিবার্য তখন ভুল বুঝতে পেরে ইলা আত্মসমর্পণ করে। আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় জর্জরিতা ইলা নিজেকে সত্যেশের যোগ্যা সহধর্মিণী করে তোলার শপথ নিল। এই উপন্যাসে কোন সময়েই ভারসমতা ক্ষুন্ন হয়নি বা চরিত্র দুটিও হারায়নি বিশ্বাসযোগ্যতা। ফলে খুব উচ্চাংগের নাহোক একটি ভাল রসঘন উপন্যাসের স্বাদ এতে পাওয়া যায়।

ইংগবংগ সমাজের প্রভাবে উদ্ভূত সমস্যাদি, নারীর সামাজিক পদমর্যাদা ও প্রতিবন্ধকতা সম্বলিত এ ধরণের জীবনবাচ্য বা ঘটনার সমাবেশ বর্তমানের সমৃদ্ধ বহুপল্লবিত সাহিত্যক্ষেত্রে অনেকটাই অনুজ্জ্বল ও তাৎপর্যবিহীন। কিন্তু পঞ্চাশ ষাট বছর আগে এসব প্রশ্ন ও সমস্যা অনেক জীবন্ত ও আলোচিত ছিল। সেই সমাজপ্রেক্ষিতে, অনুশাসন-বলয়িত পরিবেশে এই সব সমস্যা জীবনের অংগীভূত ছিল। তাই অগ্নিসংস্কারে যে সমস্যা, যে প্রশ্ন ও দ্বিধা তা বর্তমানে যতই অসার ও মূল্যহীন হোক না কেন, নরেশচন্দ্রের লেখার সময়ে অতি সচল ও জটিল ছিল।

'লুপ্তশিখা'তে মালতীর চরিত্রচিত্রণ অনেকটা শরৎচন্দ্রের প্রভাবপুষ্ট। পতিতা নারী মালতীর বাইরের জীবনযাত্রা ও অন্তরের দ্বন্দ্ব মোটামুটি ভার-সাম্য বজায় রেখেছে। বটু অনাথ বালক, তার প্রতি মালতীর স্নেহ ও ভালবাসা অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই দেখানো হয়েছে যদিও শরৎচন্দ্রের কোন কোন নারী

চরিত্রকে বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয়। ঘটনার আবর্তে, পারিপার্শ্বিকতার চাপে সে তার কোমল ও সুন্দর প্রবৃত্তিগুলিকে অটুট রাখতে পারে নি, কিন্তু পঙ্কিলতার গহ্বরে নিমজ্জিতা হয়েও স্থানে স্থানে তার নারীত্বের অস্পষ্ট স্ফুরণ ও বিকাশ সার্থক চরিত্রসৃষ্টিরই সাক্ষ্য দেয়। এই উপন্যাসে তিনি যে সংযম, কলাকুশলতা ও বাস্তবানুবর্তিতা দেখিয়েছেন তা যেন অনেকটা নরেশচন্দ্রের স্বভাববিরোধী। হয়ত সেই কারণেই লুপ্তশিখা ভাল উপন্যাসের পংক্তিভুক্ত।

তাঁর উপন্যাস ও গল্পে দেখা যায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সমাবেশ, তাঁতি, জোলা, মুচি, দোসাদ কেউই বাদ পড়ে নি। তবে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত বিচিত্র স্বভাবের নরনারী কেউই বিশেষ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে নি। তাদের চলাফেরা আচার আচরণ অনেকটাই লেখকের মর্জিমত হয়েছে, স্বাভাবিক ও বাস্তব হয়ে ফোটে নি। কখনো মধ্যবিত্ত ও মধ্যশিক্ষিতদের মুখে শোনা গেছে ইতর জনোচিত ভাষা আবার বস্তিবাসীর মুখে কেতাবী সংলাপ। কলমের ডগায় সব কিছু জন্মায় বলেই এধরণের অসংহত বিন্যাস, অমার্জিত প্রকাশভঙ্গী। কলম চলতে চলতে কথা হয় বলেই ভদ্র ইতর, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র কোন চরিত্রই নিজের সত্ত্বা অপরিবর্তিত রাখতে পারে না।

যেহেতু মনের মধ্যে একটা বিশেষ ধারণা বা মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তাঁর অধিকাংশ রচনা, তাই উদ্দেশ্যমূলক লেখার সব দোষই তাঁর লেখায় প্রকটিত। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য এ বিষয়ে স্মরণীয়। "পাপ বা যৌন আকর্ষণের তথ্য আবিষ্কার সম্বন্ধে লেখক এতই নিবিষ্টচিত্ত যে চরিত্র সৃষ্টি তাঁহার নিকট গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট নরনারী কেবলমাত্র তত্ত্বের বাহন হইয়াছে। রক্ত মাংসের সজীব মূর্তি হইয়া উঠে নাই। ইহার উপর অতর্কিত ঘটনা সমাবেশ ও অসম্ভব রকমের দ্রুত চরিত্র পরিবর্তনে ইহাদের বাস্তবতাকে আরও ম্লান করিয়া করিয়া দিয়াছে। সামাজিক উপন্যাসের সূক্ষ্ম ও তথ্যবহুল বিশ্লেষণের সঙ্গে রোমান্সসুলভ অতর্কিত পরিবর্তনের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণই এই উপন্যাসগুলির প্রধান ত্রুটি।......নরেশচন্দ্রের তীক্ষ্ণ মানসিকতা এবং চিন্তাশীল বিশ্লেষণ নৈপুণ্য তাঁহার উপন্যাসগুলিতে পাওয়া যায়। তাঁহার প্রধান অভাব হইতেছে রসানুভূতি ও ভাব সঞ্চারের তীব্রতার। অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রগুলির মধ্যে যে পরিমাণ জটিলতা আছে তদনুরূপ ভার গভীরতা নাই। বিশেষতঃ বর্ণনার সাবলীল ভঙ্গী ও সরস বিস্তার তাঁহার

উপন্যাসে অতি দুঃপ্রাপ্য। অগণিত উপন্যাস হইতে এমন কোন দৃশ্যের উল্লেখ করা যায় না যাহা স্মৃতির উপরে উজ্জ্বল বর্ণে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে।" বহু বিচিত্র ও অসংখ্য উপন্যাসের লেখক নরেশচন্দ্র সম্বন্ধে এই মন্তব্য দুঃখের সঙ্গেই মেনে নিতে হয়।

শক্তি ও ক্ষমতার পরিমাণ যাই থাক না কেন, তাঁর সাহিত্যপ্রীতি ও অনুরাগ সম্বন্ধে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। কারণ অধ্যাপনা ও আইনব্যবসা সত্ত্বেও কোন দিন তাঁর কলম থেমে থাকে নি। ব্যবহারজীবীর সংকীর্ণ পরিধিতে আবদ্ধ রাখেন নি নিজের সৃষ্টিশীল মনকে। একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন করেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য। সাহিত্যের প্রেরণা ছিল অনেকটা সহজাত। পেশাগত অভিজ্ঞতা, ইউরোপের নতুন ভাবধারা এবং সর্বোপরি নতুন কিছু করার উম্মাদনা নিয়েই তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন সাহিত্য আসরে। প্রতীচ্য সাহিত্যও তখন চিন্তাবিপ্লবে তরঙ্গায়িত। নরনারীর হৃদয়ের গভীর অভ্যন্তরে নিহিত চেতন, অচেতন ও অবচেতন স্তরে যৌন আক্ষেপ ও আশ্লেষের স্বরূপ নির্ণয়ে নতুন মতবাদ, নতুন দৃষ্টিকোণ দেখা দিয়েছিল। ফ্রয়েডের তত্ত্ব, ডারউইনের সূত্র, মার্কসের মতবাদ সব মিলিয়ে চিন্তাজগতে বিপুল আলোড়ন। এই মনীষীদের প্রভাব বহুধা প্রসারিত হল যা থেকে মুক্ত হতে পারে নি কেউ, ঔপন্যাসিকরা তো বটেই। নরনারীর প্রণয়লীলার রহস্যময়তার এক নূতন অর্গল খুলে গেল এবং এযাবৎ দুর্জ্ঞেয় বা ভাসা-ভাসা জ্ঞান ও ধারণাকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করার জন্য এক আনন্দ-উল্লাসের স্রোত বইতে লাগল। সকলেই এর ভাগীদার ও অংশীদার হবার জন্য উন্মুখ হলেন। প্রেমের নানা জটিলতা দৈহিক কামনা ও চাহিদা সম্বন্ধে অনেকেরই যেন সম্যক অবহিতি জন্মাল। আর সেই সঙ্গে নিষিদ্ধ প্রেম ও প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কৌতূহল মেটানোর এক দুর্বার আকাঙ্খা সঞ্জাত হল অনেকের মনে। প্রথম যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সেই অবসন্নতা, শূন্যতাবোধের যুগে ফ্রয়েড, এলিস, মার্কস প্রভৃতি চিন্তাবিদদের সিদ্ধান্তসমূহ এবং সেই সঙ্গে লরেন্স, হাক্সলে ও জয়েসের যৌন বিশ্লেষণাত্মক গল্প উপন্যাস বাংলার তরুণ সমাজে বিশেষ করে সাহিত্যপ্রয়াসীদের মধ্যে বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। যে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত, যাকে বুদ্ধি ও সামাজিক অনুশাসন দিয়ে এতদিন অবদমিত করে রাখা হয়েছিল তারই বিস্ময়কর উদ্ঘাটনে আমাদের যুগলালিত ও চিরাচরিত সকল ন্যায়নীতি

বোধ আহত হল তীব্রভাবে। ফলে যে সঙ্কোচ ও আব্রু, যে দ্বিধা ও জড়িমা নরনারীর প্রণয় সম্পর্ককে বা তার প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করত তাই যেন নিমেষে ভেসে গেল এক বাধাবন্ধহীন উদ্দাম স্রোতে। যতই রূঢ় ও নগ্ন হোক না কেন সত্যকে স্বীকার করে নেবার, তাকে প্রকাশ করার কুণ্ঠাহীন মানসিকতায় উজ্জীবিত হল তরুণ শিল্পীগোষ্ঠী যার অন্যতম পুরোধা ছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

আগের শতাব্দীতে বা এ শতাব্দীর প্রারম্ভে নারীমুক্তির বিশ্বব্যাপী জাগরণ সূচিত হয়েছিল। কিন্তু সেটা মূলতঃ কতকগুলি বিধিনিষেধ অতিক্রম এবং অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে। কিন্তু দেহকে নির্ভর করে প্রেমের যে অভিসার, তাতে নরনারীর মধ্যে কোন ভেদ-রেখা নেই, কিংবা নারীর দেহে ও মনে এই ধরণের চেতন ও অবচেতন স্তরের ক্রিয়াদি সংঘটিত হয়, এ সব তত্ত্বও স্বীকৃতি পেল, প্রকাশ ঘটল সাহিত্যে, গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে। নতুন যুগের সাহিত্যে তাই দেখা দিল সে সবের অকুণ্ঠ, অনম্র বে-আব্রু প্রকাশ। নরেশ সেনগুপ্তের নায়িকাদের মধ্যেও এই অভিব্যক্তি ও অনুরণন লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রচারে ব্রতী হলেন যে নারী শুধুই পুরুষের জৈব প্রবৃত্তি নিবারণের জন্য অথবা তার পুরুষত্বকে পূর্ণতা প্রদানের জন্যই পৃথিবীতে আসে নি। তারও নিজস্ব একটা সত্ত্বা আছে। মনে আকাঙ্ক্ষা আছে, দেহে আছে ক্ষুধা।

যাঁরা স্থিতধী, প্রত্যয়নিষ্ঠ, নিজেদের জীবনদর্শন ও আদর্শে সুস্থিত ও প্রগাঢ় আস্থাশীল, তাঁদের রচনায় কোথাও এর কোন অস্পষ্ট ছায়া পড়লেও সামগ্রিকভাবে তাঁদের চিন্তা ও বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। পারা সম্ভবও নয়, কারণ তাঁদের উপলব্ধি ও জীবনবোধ অনেক গভীরেই নিহিত। অবশ্য নতুন ধারণা বা চিন্তা গ্রহণ না করার মত সংকীর্ণ তাঁরা নিশ্চয়ই নন কিন্তু যা অস্পষ্ট, কোন স্থির সর্বজনগ্রাহ্য ধ্রুব সত্য নয়, শুধু আবেগের বশে, নতুন কিছু করার উন্মাদনায়, প্রচলিত সব কিছুকে নস্যাৎ করার প্রবণতায় তাঁরা এই ভাবধারাকে একমাত্র উপজীব্য, অনুসরণীয় বলে মেনে নেন নি। কিন্তু বিকচোন্মুখ ও প্রতিষ্ঠাকামী লেখক ও শিল্পীদের কাছে প্রতীচ্যের উল্লিখিত মনীষীদের আবেদন ছিল অপ্রতিরোধ্য। নরেশ সেনগুপ্তও সমগ্র মন প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করলেন এঁদের চিন্তা, মতবাদ ও সিদ্ধান্তকে। আর তারই ফলস্বরূপ তাঁর বহু রচনায় নরনারীর দেহ সম্পর্কে এত ঘটনা ও সঙ্গে মাত্রাধিক্য। তবে

ফ্রয়েড ও মার্কসের মতবাদ যে তাঁর মানসিকতার উপরিভাগেই স্থান নিয়েছিল তার প্রমাণ অজস্র। নিজের প্রত্যয় ও আত্মজিজ্ঞাসায় অভিভূত হয়ে নতুনতর জীবনবোধে উজ্জীবিত হতে পারেন নি। নইলে 'শাস্তি', 'ভুলের ফসল' প্রভৃতি উপন্যাসে যে তাত্ত্বিক বৈপ্লবিকতার উন্মেষ যাঁর লেখনীতে স্পষ্ট, তাঁরই কাছ থেকে পাওয়া গেল অভয়ের বিয়ে, তারপর রবীন মাস্টার প্রমুখ সেকেলে বস্তা-পচা রোমান্টিক উপন্যাস।

আসলে নিজের ধ্যানধারণা সম্বন্ধেও কোন স্পষ্টতা তাঁর ছিল না। রোহিনী ও বিনোদিনীর ভালবাসাকে তিনি দেহজ কামনার অতিরিক্ত ছাড়া আর কিছুই মনে করেন নি। স্রষ্টাদের উন্নত ও রক্ষণশীল মনোভাবের জন্যই এদের মনের অভ্যন্তর সম্যক পরিস্ফুট হয় নি বলেই তিনি মনে করতেন। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ সমাজকে মান্য করতেন। তার অনুশাসন মেনে চলতেন তাই নারীর দেহজ কামনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁদের রচনায় নেই। সুতরাং সেই অপূর্ণতা ঢাকতে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন তিনি। তাঁর রচনায় এইসব অস্বচ্ছ ও অস্পষ্ট কামনা বাসনাকে আরো সুরেখ ও স্পষ্ট করতে প্রয়াসী হলেন উদ্ধত ও স্পর্ধিতভাবে, সম্ভব অসম্ভবের প্রতি কোন দৃকপাত করেন নি কখনো। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব এবং দুর্বলতা।

দুর্বলতা এইজন্য যে রচনার এই অসংলগ্নতা বা বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারার জন্য নিজেকে সার্থকতায় উত্তীর্ণ করতে পারেননি। আর কৃতিত্ব গতানুগতিকতার বেড়াজাল ভাঙার, নতুন ক্ষেত্র বিস্তারের। এই প্রসঙ্গে জগদীশ গুপ্তর নাম অনিবার্যভাবেই মনে আসে। তিনিও ঐতিহ্যানুসারী নন, সহজ সরল ভাবে জীবনকে তিনিও দেখেননি। তিনি এক ক্রুর নিষ্ঠুর নিয়তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন মানুষের ভাগ্যনিয়ামক রূপে। দেহের বাইরে মনের সৌকুমার্য ও পেলবতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। এই মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি সঞ্জাত, বাইরে থেকে আমদানি করা কিংবা পুঁথি থেকে আহরণ করা নয়। সেই জন্য শুধু দেহের ক্ষুধা ও দেহজ কামনা কখনো একমাত্র উপজীব্য হয়ে দেখা দেয়নি তাঁর উপন্যাসে। দেহের চাহিদার সঙ্গে সমাজ, সামাজিক অবক্ষয়, মানুষের নিষ্ঠুরতা, সমাজপতিদের পাষণ্ডতা সবই মিশে গিয়েছে ওতপ্রোতভাবে। আর সব কিছু ছাপিয়ে এক উপলব্ধি—মানুষ কত অসহায়, নিয়তির নিপীড়নে সে কত জর্জরিত, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে প্রতি উপন্যাসে। যার ক্ষমতা

নেই, প্রতিপত্তি নেই, যশ অর্থ নেই, সংসারে তার কিছুই নেই। অনেকটা সাম্যবাদী চিন্তাধারা যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাঁর রচনায়। অথচ এই মতাদর্শের প্রচারণা কখনো করেননি সজ্ঞানে, সচেতনভাবে। তাঁর নারী চরিত্রগুলিও অধিকাংশই নিচুতলার, তবু বিশেষ স্বাতন্ত্র্য নিয়েই উপস্থিত। সংসারের পীড়নে, সমাজের পীড়নে তাদের নারীসত্তা জাগ্রত হয়ে উঠেছে। তাই মদ্যপ হীনচেতা স্বামীকে পশুরূপে ভাবতে কোন দ্বিধা বা সংশয় দেখা দেয় না তাদের মনে। এই সব মনোভাব অতি অকৃত্রিমভাবেই মিশে রয়েছে জগদীশ গুপ্তর লেখায় যা নরেশচন্দ্রের ক্ষেত্রে বলা যায় না। অনেকটা অতর্কিত, আরোপিত, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা। ভাবটা যেন সজ্ঞানে সবকিছুকে উপেক্ষা করা, অবজ্ঞা করা। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে দুজনেই বাংলা উপন্যাসকে পূর্ববর্তী পিউরিটান প্রভাব থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন এবং কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। ব্যতিক্রমী সাহিত্যিক হিসাবে দুজনেই সমান কৃতিত্বের অধিকারী।

যে কল্লোল যুগের আবির্ভাব বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও সম্ভাবনাকে বহুবিস্তৃত করেছিল তার অন্যতম কেন্দ্রীয় পুরুষ বুদ্ধদেব বসু প্রথম সাহিত্য জীবনে নরেশচন্দ্রের দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে অনুসরণীয় বলেও মনে করতেন। কল্লোল গোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যিকদের হতাশা, যুগযন্ত্রণা, আশাভঙ্গের ক্লেশ এবং জীবনের তাৎপর্য সন্ধানে আত্মক্ষয়ী অনুসন্ধিৎসা—তা অবশ্য নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর মধ্যে ছিল না। তবে যে মিথুন প্রবৃত্তির আতিশয্য রবীন্দ্রনাথ কল্লোলপন্থীদের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন তার উৎস কিন্তু নরেশচন্দ্র। শুধু মিথুন প্রবৃত্তির উন্মোচন, উদ্ঘাটন ও বিশ্লেষণই তাঁর একমাত্র প্রতিপাদ্য ছিল, একথা বললে তাঁর প্রতি অবিচারই করা হবে। সাহিত্যের আঙিনায় যেসব চিন্তা ও ভাবনা ছিল অশুচি ও অনভিপ্রেত অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের আমলে, তিনি সেসবকে চিত্রিত করেছেন সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে। কোন কুন্ঠা বা সঙ্কোচ তাঁর প্রয়াসের অন্তরায় হতে পারেনি। আর তারই ফলে বাংলা সাহিত্যে উন্মোচিত হয়েছিল এক নূতন দিগন্ত। হঠাৎ সে যেন অনেকটা অর্গলমুক্ত, জড়তাহীন গতি পেয়ে গেল। তাঁরই পথের অনুসরণ ও অনুকরণে প্রতিভাবান সাহিত্যিকবৃন্দ নিজেদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে নিজেদের শক্তি ও মনীষায় জীবন-ভূয়িষ্ঠ করে তুললেন

বাংলা সাহিত্যকে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় যথার্থ মন্তব্য করেছেন, "তাঁহার অবিসংবাদিত চিন্তাশীলতার সহিত যদি আশানুরূপ ভাব-গভীরতা ও কল্পনা-শক্তির সংযোগ হইত তবে এই সমন্বয় উপন্যাসের ক্ষেত্রে নবরাজ্য প্রতিষ্ঠার গৌরব লাভ করিতে পারিত। বর্তমানে তিনি কেবল কতকগুলি নূতন ইংগিত ও পথ নির্দেশের কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন। তথাপি এই নূতন ধারা প্রবর্তনের দ্বারা তিনি যে উপন্যাসের সীমা প্রসারিত করিয়াছেন তাহা সর্বতোভাবে স্বীকার্য।" ঐতিহাসিক এই স্বীকৃতির মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের আসন অক্ষয় হয়ে থাকবে। তাঁর অসংখ্য রচনার অসংখ্যতর ত্রুটির মধ্যেও এই অবদানটুকু বিরাট কয়লাপুঞ্জের মধ্যে হীরকের দ্যুতি নিয়েই চিরস্থায়ী হবে।

জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)

অনেক কাছের মানুষ হবার যাঁর কথা ছিল অর্থাৎ যাঁর সম্পর্কে তাৎক্ষণিক কিছু আলোচনা, ইতস্তত কথা ও মন্তব্যে ক্ষণিক অবস্থিতি অথবা ক্ষুদ্র সাংস্কৃতিক আলোচনায় সামান্য উল্লেখ ইত্যাদি যেসব ঘটলে কারও সঙ্গে নৈকট্য স্থাপন করা যায় জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে এর বিন্দুমাত্র তো নেইই বরং একটা অব্যাখ্যাত ঔদাসীন্য এবং অযৌক্তিক নিস্পৃহতায় তিনি আমাদের অনেক দূরে। Survival of the fittest অন্য সব কিছুর সম্পর্কে যেমন, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে তেমনিই প্রযোজ্য। জোর করে প্রচারের মাধ্যমে তাঁকে কিংবা তাঁর সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না—এই সত্যটি মেনে নিয়েও বলা যায়, জগদীশ গুপ্ত মহাশয়ের কাছে আমাদের ঋণ খুব অনুল্লেখ্য নয়। আমাদের সাহিত্যের যখন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হবে, আদি থেকে বর্তমানের উৎস এবং পারম্পর্যের গতি ও প্রেরণা সম্পর্কে যখন আরো বিশদ এবং বিস্তারিত অনুসন্ধান চলবে, তখন জগদীশ গুপ্তের স্থান 'They also serve' এর চাইতে অনেক বেশীই হবে। বাংলা কথাসাহিত্য যে আভিজাত্য এবং সাধারণের অনতিগম্যতায় গণ্ডীবদ্ধ ছিল বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের সাম্রাজ্যে, তারই বন্ধনমুক্তি ঘটিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। আর শরৎচন্দ্রের সাবলীল স্বচ্ছ প্রবাহ আজ যাদের সাধনায় এত বহুধা ও ব্যাপক, যাঁদের প্রতিভা, সাধনা ও সৃজনক্ষমতায় আমাদের সাহিত্য আজ বিশ্ব-সারস্বত সভায় সগৌরব স্থান অধিকার করে আছে, জগদীশ গুপ্ত নিঃসন্দেহে তাঁদের একজন। যদিও তাঁর ব্যক্তিজীবন তো বটেই, সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধেও আমাদের অধিকাংশ অনভিজ্ঞ এবং অনালোকিত। অথচ অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"এই ভাঙনের ধারা বেয়ে আরও একজন আসিয়াছিলেন তিনি জগদীশ গুপ্ত। সতেজ, সজীব লেখক—বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। দুর্দান্ত সাহসে অনেক উদ্দীপ্ত গল্প লিখিয়াছেন। বয়সে কিছু বড়, কিন্তু বোধে সমান তপ্তোজ্জ্বল। তাহার যে দোষ তাহা তারুণ্যের, হয়ত বা প্রগাঢ় প্রৌঢ়তার। কিন্তু আসলে যে তেজী তাহাকে কোন দোষ অর্শে না। যেখানে আগুন আছে,

সেখানেই আলো জ্বালিবার সম্ভাবনা। জগদীশ গুপ্ত কোনদিন কল্লোল আপিসে আসেন নাই। মফঃস্বল শহরে থাকিতেন। সেখানেই থাকিয়াছেন স্ব-নিষ্ঠায়। লোক-কোলাহলের মধ্যে আসিয়া সাফল্যের সার্টিফিকেট খোঁজেন নাই। সাহিত্যকে ভাল বাসিয়াছেন প্রাণ দিয়া, প্রাণ দিয়া সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। স্বস্থান-সংস্থিত একনিষ্ঠ শিল্পকার। অনেকের কাছেই তিনি অদেখা বা অনুপস্থিত। নদী বেগ দ্বারাই বৃদ্ধি পায়। আধুনিক সাহিত্যে তিনি একটা বড় রকমের বেগ। যৌবন যে বয়সে নয়, মনের মাধুরীতে, জগদীশ গুপ্ত তাহার প্রমাণ।' সৃষ্টির ভরা যৌবনে যিনি অনেকের কাছেই অদেখা এবং অনুপস্থিত, আজ এত দীর্ঘদিন পরে তিনি যে বিস্মৃতিতে নিমজ্জিত হবেন তাতে আশ্চর্য কি !

কুষ্ঠিয়ায় বিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় সাহিত্যের প্রতি দুর্লঙ্ঘ্য আকর্ষণের জন্য তাঁকে তিরস্কৃত হতে হয়। এর উপর আবার যখন কবিতা রচনা ধরা পড়ে এবং এসব কবিতা নারীর দেহ ও মন সম্পর্কে কিশোর চিত্তের আকূতি ও কৌতূহল মন্ডিত, তখন তাঁকে চলে আসতে হয়েছিল কলকাতায়, তীক্ষ্ন নজর এবং কড়া শাসনে অন্তরীণ হয়ে। সিটি কলেজে ভর্তি হবার পরেও চাপা রইল না তাঁর সাহিত্য সাধনা। তাই নীতিশাসিত কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকদের চোখে বিষম অপরাধের দায়ে অপরাধী হয়ে তাঁকে পাঠাস্থল ত্যাগ করতে হল। এবার রিপণ কলেজ। কিন্তু ব্যক্তিগত খেয়াল এবং পারিবারিক চাপে অচিরেই বাধ্য হলেন কর্মজীবনে প্রবেশ করতে। একের পর এক কর্মস্থল পরিবর্তিত হল। বীরভূম, কটক, সম্বলপুর, পাটনা এবং অবশেষে বোলপুরে। ক্ষুদ্র চাকুরী, দায় দায়িত্ব বেশী নয়। অবসর এবং অবকাশ দুইই ছিল প্রচুর। আর এই অবকাশেই তিনি মেতে উঠলেন সাহিত্যসৃষ্টিতে। কলকাতার মাসিক পত্র পত্রিকায় নিয়মিত লেখা পাঠাতেন, ছাপা হত এবং দক্ষিণাও পেতেন। বঙ্গবাণী, কালিকলম, কল্লোল প্রভৃতিতে যখন ছাপা হতে শুরু করল তাঁর গল্প উপন্যাস তখনই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থানটি যেন সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল। এসব পত্রিকার সম্পাদকের চাহিদা ক্রমশই বেড়ে উঠল আর তিনিও সেই চাহিদা মিটিয়েছেন অকৃপণভাবে।

প্রথম গল্প পুস্তক 'বিনোদিনী' প্রকাশ করলেন নিজের চেষ্টায় এবং অর্থব্যয়ে। প্রথম সে পদক্ষেপ ব্যর্থ হল না। সেই সময় বস্তিবিষয়ক সাহিত্য এবং যৌনতা নিয়ে বিশেষ বাড়াবাড়ি চলছিল। প্রথমে অনেকে এতে নতুনত্বের

স্বাদ পেলেও পরে বিরক্তিকর একঘেয়েমিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, একটা বদ্ধ জলাশয়ের যেন সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বিনোদিনী সেই পঙ্কিল বদ্ধতাকে মুক্ত করে দিল। নিয়ে এল নতুনতর চিন্তা, অনেকটা বৈপ্লবিক, কলুষহীন। প্রাচীনতার গন্ডীভেদী, কিন্তু সমসাময়িক পঙ্কিলতার উর্ধ্বে। জগদীশ গুপ্তের স্টাইল ও ভাষা, গল্পের বিষয়বস্তু ও গঠননৈপুণ্য লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'তোমার গল্পে নতুন রূপ ও রস দেখিয়া খুশী হইলাম।' কবি স্বভাবতই তৎকালীন লেখকদের কটাক্ষ করে জগদীশ গুপ্তকে সাহিত্যের আসরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। 'সাহিত্যে দুঃখবাদ' নামক প্রবন্ধে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক-পন্ডিচেরী খ্যাত অনিলবরণ রায় মন্তব্য করেছিলেন, 'বিনোদিনীর গল্প গুলিতে দুঃখবাদ অতি প্রবল, লেখকের লিখন পটুতা সংযত এবং অনুভূতি প্রকাশের অসাধারণ শক্তির দরুণ এই দুঃখবাদ যারপরনাই অত্যন্ত মর্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে। জগদীশবাবু যেন বলিতে চান নিজেকে বাঁচাইবার কোন পথ মানুষের চোখের সম্মুখে নাই। সে একটি দুর্নিরীক্ষ্য আর অতি হিংস্র শক্তির হাতে অশক্ত ক্রীড়নক মাত্র।

এই বিনোদিনীর ধারা বেয়েই এল লঘুগুরু, রোমন্থন, রতি ও বিরতি, অসাধু সিদ্ধার্থ, দুলালের দোলা, নন্দ ও কৃষ্ণা, গতিহারা জাহ্নবী, যথাক্রমে, সুতিনী এবং অসংখ্য গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি। লঘুগুরু উপন্যাসে দেখতে পাই সমাজের নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতার এক করুণ ও মর্মান্তিক চিত্র। দেহোপজীবিনী উত্তম, যাকে বিশ্বম্ভর রেখেছে নিজের এবং বন্ধুবান্ধবের পাশব উল্লাস চরিতার্থ করার জন্য, তারই প্রভাবে আবিষ্ট হয়ে বিশ্বম্ভরের রূপান্তর এবং উত্তমের স্বামী কন্যা নিয়ে শান্ত স্নিগ্ধ একটি গৃহসুখের কল্পনা অতি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। বারবণিতা উত্তমের নিঃস্বার্থ ভালবাসা, মা-মরা টুকির সর্বগুণান্বিতা হওয়া সত্ত্বেও এক বারাঙ্গনা দ্বারা পালিতা হওয়ার অপরাধে গাঁজা-খোর মাতাল দুশ্চরিত্র পরিতোষকে স্বামীত্বে বরণ করা এবং তারই অর্থোপার্জনে সহায়তা করার জন্য ইয়ার বন্ধুদেরকে দেহ দানে প্ররোচিতা হওয়া প্রভৃতির মধ্যে যে কারুণ্য ও অসহায়তার চিত্র ফুটে উঠেছে তা সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিমানসের বাস্তব রূপায়ণ। পরিচয় পত্রিকায় লঘুগুরুর সমালোচনা করে-ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কাহিনীর ঔচিত্য এবং সম্ভাব্যতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলে বিস্তারিতভাবে এর আলোচনা করেন। যে সত্য ও সুন্দরের সাধনায়

তিনি আজন্ম ধ্যানাবিষ্ট ছিলেন, সেখানে জগদীশ গুপ্তর রচনার ক্লিন্ন ক্লিস্ট চরিত্র ও তাদের কার্যকলাপ যে তাঁর অনুমোদন পাবে না তা বলাই বাহুল্য। তাই রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে নিজের ক্ষোভ এবং অসন্তোষ আবৃত রাখতে পারেন নি। অথচ এই উপন্যাসের বাস্তবতা ও অন্তর্নিহিত সত্যকেও সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারা যায় না। অনেক বিচার বিশ্লেষণ করে ঔপন্যাসিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেও তিনি লিখলেন, 'জগদীশের রচনানৈপুণ্য আছে।'

পতিতাদের প্রেম, তাদের বাৎসল্য এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের পরিধি যে স্তরে নিহিত, জগদীশ গুপ্ত তার চেয়ে একধাপ বেশী অগ্রসর হয়েছেন। দুজনেরই রচনার প্রধান পটভূমি গ্রাম ও গ্রামীণ সমাজ। এই পর্যন্তই তিনি শরৎচন্দ্রের পদাঙ্কানুসারী। শরৎচন্দ্রের জগৎ প্রধানত মধ্যবিত্ত-বলয়িত। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শ্রেণীর চরিত্র শরৎ রচনায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তারা স্ব-শ্রেণী ও সমাজের প্রতিভূ না হয়ে একটি বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জগদীশ গুপ্ত ভাবাবেগ বা ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেন নি। নৈতিক মূল্যবোধের ক্রমাবক্ষয়ে শরৎচন্দ্রের পাত্র পাত্রীরা পীড়িত ও ব্যথিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাশ্বত মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বীকৃতি তাঁর গল্প উপন্যাসে দেখা যায়। জগদীশ গুপ্ত সে পথের পথিক ছিলেন না। আদিম ও নিরাবরণ এক জৈব প্রবৃত্তির দ্বারা সবাই তাড়িত। এই প্রবৃত্তির তাড়না ও তাগিদে তাদের বেঁচে থাকা। তাই ন্যায়-নীতি, পাপ-পুণ্য, বিবেক-অনুশোচনা এসব নিয়ে তারা আদৌ চিন্তিত নয়। বাঁচা মানেই দেহের অস্তিত্ব বজায় রাখা আর তার জন্য চাই অর্থ, প্রতিপত্তি, সমাজের মান্যতা এবং অন্যের উপর আধিপত্য স্থাপন, তা যেভাবেই অর্জিত হোক না কেন।

রোমন্থন উপন্যাসে গোটা শ্রেণী ও সমাজকে আরো করুণ ও উলঙ্গভাবে চিত্রিত করেছেন তিনি। এই উপন্যাসের ভূমিকায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখলেন, "জগদীশ গুপ্ত শরৎচন্দ্রেরই গোত্রজ। তাঁরই প্রতিভার মানসপুত্র। এই বস্তুতন্ত্র সংসারের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, কামনা-বাসনার পাঁকে অনুপম পদ্ম ফুটিয়ে তোলার শিল্পী এঁরা। আকাশের আলো সে ধরিত্রীর অন্ধকারেরই গর্ভজাত সন্তান।......এই সুন্দরের জগতে পাপপুণ্য নেই। আছে জগৎ ও স্রষ্টার অভিনব নব নব রসের ভিয়ান। রোমন্থনে পল্লীর কদর্যতা, ক্ষুদ্রতা,

ক্লেদ ফুটেছে একটু বেশী বস্তুতান্ত্রিকতা ঘেঁষে; অপদার্থ ধনী শহুরে বাবু তিনটির আশে পাশে অভয়, কালোশশী, প্রাণনাথ, মদন ও গ্রাম্য মানুষগুলি আসছে যাচ্ছে এক বিচিত্র দৈন্যের ছবি ফুটিয়ে......মাঝে মাঝে কবিত্ব আছে আর সাহিত্যের পরিপাট্যের তো কথাই নেই।" এই উপন্যাসের নায়িকা মাধবীর চরিত্র এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি নিখুঁত ভাবে এঁকেছেন: "স্বামী বলিয়া স্বামীর উপর ভক্তি আছে। কিন্তু আস্থা নাই, সব জানিয়াও নাই। প্রথম পুত্রটির মৃত্যুর পরই তাহা নিরবশিষ্ট হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেছে। প্রতিপালক হিসাবে স্বামীর কতটা মুরোদ তাহা প্রতিদিনই দেখা যাইতেছে। প্রতিকূল অবস্থার সংগে যুঝিয়া স্বামীর দেহ ক্ষয় হইতেছে তাহা মাধবীর চোখে পড়ে। কিন্তু বুঝিয়াও নিজের মনের যন্ত্রণার তাড়নায় নিরুপায়ের প্রতি ধৈর্য থাকে না।" তারপর মৃত পুত্রটির চিত্রটি, 'দূরে কে যেন কাঁদিতেছে—শব্দ আকাশের দিকে উঠিয়াই নিঃশব্দে থিতাইয়া নামিতেছে। পৃথিবীর যেখানে সচল-অচল, সজীব-নির্জীব যে বস্তু আছে তাহারই অভ্যন্তরে নিঃশব্দে সে ধ্বনি প্রকাশ করিতেছে। কেবল নির্বাপিত চক্ষু দুটি স্থির, এত জমাট স্থির যে তার কূল কিনারা, মাপ-পরিমাপ, জ্ঞান-ইয়ত্তা নাই। স্ত্রীর দিকে চোখ ফিরাইতে তখন তাহার সাহস নাই। বুঝি, এমন কিছু চোখে পড়িবে যাহা সে চেনে না।" আর অভয়? দৈনন্দিন কর্মের চাপে সে কুব্জ, নত, হতমান। মানুষ হিসাবে বাঁচবার অধিকার সে ভুলেছে। ভুলেই গেছে সেই স্বাভাবিক সুস্থ জীবন-যাত্রা। জীবনের প্রতিপদে এক দৈব নিগ্রহ যেন তাকে তাড়া করে আছে। অনেক কষ্টে, দুঃখে, ভাগ্যের নির্মমতায় তার হাসি পায়। কিন্তু কেমন সে হাসি! অতি করুণভাবে তা চিত্রিত হয়েছে। "অভয়ের পিতা অঘোর প্রথম জীবনে হাসিয়াছিলেন। তাহাকে হাসি বলা যায়। সুকুমার, ঋজু, স্বচ্ছ রেখাপাত করিয়া সে হাসি ফুটিত—আয়াসহীন অথচ প্রচুর সে হাসি বিকশিত হইয়া মানবাত্মার চিরন্তন সন্তোষের মধ্যে একটা কল্যাণের মূর্তিতে মুদ্রিত হইয়া যাইত। সে হাসিতে কপট কলাবত্তা ছিল না। কিন্তু উন্মোচিত বক্ষের অহৈতুকী উদারতা ছিল। হাসির শৈশব আছে। যৌবন আছে। বার্ধক্য আছে। কিন্তু হাসি যখন অসহায় হইয়া আতঙ্কে ভাঙিয়া চুরিয়া দেখা দেয়, হাসির তখন মুমূর্ষু অবস্থা। চিতার অংগারে একবিন্দু নির্জীব ও করুণ একটি হাসি পুত্রকে প্রদান করিয়া অভয়ের পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।"

উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এই করুণ ও অসহায় হাসিটিই দৈনন্দিন জীবনে অভয়কে বয়ে বেড়াতে হয়েছিল।

'অসাধু সিদ্ধার্থ' জগদীশ গুপ্তর একখানি বহুপঠিত ও আলোচিত ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস। জারজ সন্তান নটবর অর্থের লোভে এক বৃদ্ধ বেশ্যার পরিচর্যা করত। পরে নানারকমের ফন্দী ও কৌশল অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ, ধারে দেনায় আকন্ঠ নিমজ্জমান। হঠাৎ একদিন এক সর্বত্যাগী দেশ-প্রেমিকের আত্মত্যাগের সাথী হয়ে তাঁরই সিদ্ধার্থ বোস নামটি নিয়ে সংসারে নতুন যাত্রা শুরু করল। কিন্তু অভাব ও অনটনে কোন হীন কাজই তার অকরণীয় রইল না। এই সময় শিক্ষিত পরিবারের এক সুন্দরী শিক্ষিতা যুবতী অজয়ার সংগে সাক্ষাৎ হয়। শুধু নামই ভাঁড়িয়ে নয়, সেই পরলোকগত সিদ্ধার্থ বোসের যাবতীয় কৃতকর্মাদি ও বিষয় সম্পত্তি নিজের বলে পরিচয় দিয়ে অজয়ার শ্রদ্ধা ও প্রেম লাভে সক্ষম হল। তার জীবনের সব কিছু মলিন ও কালিমা লিপ্ত। কিন্তু প্রেমে পড়ার পর থেকে সে এক নতুন মানুষ। বিগত জীবনের ছায়া তাকে হানা দেয়। কিন্তু সেসব পাশ কাটিয়ে সে নতুনভাবে বাঁচতে চায়। প্রেমে উদ্দীপ্ত হয়ে নতুন আলোর সন্ধান পেতে চায়, তবু কিছুতেই আত্মস্থিত হতে পারে না। প্রাণে প্রেমের জোয়ার, দেহে কামনার আগুন। আর "সিদ্ধার্থ যেখানে, সেখানে প্রাণের ফোয়ারা সহস্র ধারায় উৎসারিত। এই প্রাণের নির্ঝরে সে অবগাহন করিয়া বাঁচিবে। রিক্তা প্রকৃতির বুকের উপর যেদিন আদি প্রাণমুকুলটি শুক্তিকোষে মুক্তাটির মত প্রথম সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল সেই দিন হইতে বাঁচিবার প্রয়াস সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। একমাত্র রব, বাঁচো, বাঁচো। অমোঘ আদেশ, অনন্ত তাগিদ, স্থবীর দুর্বলতার দোহাই দিয়া পরিহার করিবার উপায় নাই। প্রেমে পশুত্ব যে দিয়াছে সেও ধন্য। প্রেমে স্বর্গীয় দেহাতীত পবিত্রতা কল্পনা করিয়া মানুষের এই অতিষ্ঠকর কলরব কত দিনের ? দেহ স্বল্পজীবী, আত্মা অমর। কিন্তু দেহ মানুষের বাঁচবারই ইচ্ছার বিগ্রহ। শিবের পূজা শুধুমাত্র তাই মাঙ্গল্যের পূজা নয়। সৃষ্টিপ্রবাহ অক্ষয় রাখিবার তাঁর যে শক্তি, তাহারও পূজা।" নাটকীয়ভাবে যখন তার কপটতা ও চাতুরী প্রকাশ পেল তখন তার উক্তি, "ভগবান জানেন আমি নিরপরাধ। নিয়তির চক্রান্তে ভালবেসেছিলাম। ভালবাসার তাড়নায় আর প্রতিদানের লোভে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি। আমি তো মানুষ।" অনেকক্ষণ ধরেই আমাদের মনে

অনুরণিত হতে থাকে। তাঁর লেখার গুণে, অধঃপতিত মানুষের প্রতি দরদ ও সহানুভূতির রেশ আমাদের অলক্ষ্যে অতি ধীরে ধীরে আমাদের মনেও সঞ্চারিত হতে থাকে।

'রতি ও বিরতিতে' নিষ্ঠুরতা ও অসহায়তার এক করুণ ছবি ফুটে উঠেছে। স্ত্রী ও পুত্রকে হারিয়ে রাম সব কাজকর্ম ফেলে ঘুরে বেড়ায়; যেদিন যা জোটে ভিক্ষার দান তাই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। রামের জীবন ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য ও অধঃপতিত মনুষ্যত্বের যে প্রকাশ তা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক ও অন্যান্য অনেক গল্পকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য গল্প হিসাবে প্রাগৈতিহাসিক অনেক উন্নত ও রসোত্তীর্ণ। তবুও রতি ও বিরতির কিছু কিছু অংশ এ সবেরই পূর্বসূরী। গল্পের শুরুতেই দেখি, "জীবনের শেষ অধ্যায়ে রাম প্রথম কবে ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া যাত্রা শুরু করিয়াছিল, কেহই তাহা স্মরণে করিতে পারে না। বেশী দিনের কথা নয়, তবু কাহারও তাহা মনে নাই। যাচঞার প্রধান ইহাই যে দুদিনেই সে পুরাতন, চক্ষুশূল হইয়া উঠে। মানুষের মনে হয় যেন অনাদিকাল হইতে একই ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ তাহারই কাছে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার লজ্জা নাই। বিদ্রূপ এ গায়ে মাখে না। মারিতে উঠিলে সরিয়া দাঁড়ায় না। রামের জীবনকথাও অতি ক্ষুদ্র। নিজেরও সব কথা মনে নাই।.........অসংখ্য দিনপ্রবাহের মাঝে সে দিনটি জ্বলন্ত একটি বুদ্বুদের মত উত্থিত হইয়াছিল। এখনও তাহা চোখের সম্মুখে দিবারাত্র হীরকের মত জ্বলজ্বল করিতেছে। সেদিন রামের একটি পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তখন সে ভিক্ষোপজীবী নয়, সে খাটিয়া খায়।" এই খাটিয়া খাওয়া মানুষ তাদের সকল সততা সত্ত্বেও সমাজের নিষ্পেষণে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না, তিলে তিলে এক মনুষ্যেতর সত্তা তাদেরকে গ্রাস করে ফেলছে এ ধরণের বহু কাহিনী বিচিত্রতর পরিবেশে তাঁর লেখায় ভিড় করে আছে। ভাগ্য এবং দৈব সবই যেন এই সব মানুষের বিরুদ্ধে কুচক্রী।

কল্লোল যুগেই জগদীশ গুপ্তর পরিপূর্ণ বিকাশ। এই যুগের যন্ত্রণা ও অস্থিরতা, আনন্দ ও প্রেরণা তিনি অনুভব করেছেন, আত্মসাৎ করেছেন কিন্তু অনেকটা নিজস্ব ভাবেই। নিজের চেতনা-ভাবনা-ধারণা এবং আদর্শে জারিত করে; অর্থাৎ কল্লোল যুগের প্রাণ স্পন্দনে যে উদ্দামতা, নিজেকে অতিক্রম করে যাবার সীমাহীন স্পর্ধা কিংবা ঐতিহ্যমণ্ডিত সব কিছুকে ভেঙে দুমড়ে নস্যাৎ

করার যে প্রবণতা তা তিনি অন্তরে মেনে নিতে পারেন নি। তাই ভিন্নকোটিতে অবস্থিত সাহিত্যিক প্রভাত মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে যখন বুদ্ধদেব বসু বিরূপ মন্তব্য করেন তখন প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় তাঁর কলমে। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেও জগদীশ গুপ্ত নির্দ্বিধায় লিখতে পারেন, "প্রভাত বাবুর গল্পে অবাধ স্রোত আছে, স্বচ্ছন্দ গতি আছে। কৌতুকরসের সুরসাল ফল্গুধারা আছে। আদিতে ও সমাপ্তিতে অপূর্ব সামঞ্জস্য আছে। তাহাদের ছন্দালংকার ও সুরঝংকার আছে। সেগুলি পড়িতে পড়িতে ক্লান্তি আসে না। ঔৎসুক্য পঙ্গু হইয়া পড়ে না। এবং তাঁহার মানুষগুলি অসাধারণ না হইলেও জীবন্ত।" আবার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আড়ালে যে সত্য গোপন অথচ অমোঘ, যার অস্তিত্ব ও প্রকাশে তথাকথিত অনেক সুন্দরই যে বে-আব্রু অসুন্দরে পরিণত হয় তাকেও রূপায়িত করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। দেহকে স্বীকার করে নিয়েছেন। দেহের নামে যে লজ্জাকুণ্ঠ নীতিনির্দেশ দেখা যেত সে সবকে উপেক্ষা করতে কোন জড়তা বা দ্বিধা ছিল না তাঁর মনে। কিন্তু দেহসর্বস্বতার মনোভাব কখনো চরম অশ্লীল বা পংকিল হয়ে ফুটে ওঠে নি তাঁর লেখায়। "দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন তাঁর সাহিত্য সাধনার মৌল প্রেরণা বলা যায়। এবং হয়ত এই কারণেই কবি সমালোচক মোহিতলাল জগদীশ গুপ্তর লেখার গুণগ্রাহী ছিলেন। মোহিত-লালের আস্থাভাজন এবং প্রশংসার্হ হওয়া খুব একটা সহজসাধ্য ছিল না। কোন নৈতিক ত্রুটি, চারিত্রিক স্খলন এবং স্বভাবধর্মের বিচ্যুতির প্রতি মোহিতলাল ছিলেন ক্ষমাহীন দুর্বাসা। এহেন মোহিতলালের ইচ্ছা ছিল জগদীশ গুপ্তের রচনাসমগ্র থেকে বাছাই করে একটি সংগ্রহ প্রকাশ করা, যার ভূমিকা তিনি নিজেই লিখবেন। উদ্দেশ্য জগদীশ গুপ্তর সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করা, রচনার সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো। দুর্ভাগ্য আমাদের, সে পরি-কল্পনা বাস্তবায়িত হয় নি।

জগদীশ গুপ্তব রচনায় যে কুটিল এবং ক্রুর নিয়তির প্রাবল্য সে সম্বন্ধে মোহিতলাল লিখেছিলেন, "মানুষের জীবনে একটা অতিশয় দয়াহীন ও দুর্জ্ঞেয় দৈব নির্যাতনের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে; মনে হয় জীবনের আলোকোজ্জ্বল নাট্যশালার এক প্রান্তে একটা অন্ধকার কোণ আছে, যেখানে একটা নামহীন আকারহীন হিংস্রতা সর্বক্ষণ ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে মানুষ তাহারই যেন এক

অসহায় শিকার; তাহার নিষ্ঠুরতাও ভয়ংকর নয়—যত ভয়ংকর তাহার সেই অতিপ্রাকৃত রূপ। যাহাকে আদিম মানুষের কুসংস্কার অথবা বিকারগ্রস্ত রোগীর দুঃস্বপ্ন বলা যায়—সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের সুস্থ বুদ্ধি যে সকল ঘটনাকে কল্পনার বিরোধী বলিয়া মনে করে জগদীশচন্দ্র তেমন ঘটনাকেও তাঁহার গল্পে শুধু সম্ভাব্যতা নয়—এমন বাস্তবতামণ্ডিত করিয়াছেন যে ইংরাজীতে যাহাকে bizarre বলে সেই ভাবে আমাদের অভিভূত করে। মনে হয় আমরা এমন একটা বস্তুর সম্মুখীন হইয়াছি যাহা মানুষের বুদ্ধি ও জাগ্রত চৈতন্যের আগোচর, সৃষ্টির নেপথ্যে যে পাঞ্চভৌতিক শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এ সকল যেন তাহারই ক্বচিৎ দৃষ্ট মূর্তি, আদিম মানুষের অপ্রবুদ্ধ চেতনায় ইহার ছায়া পড়িত।······এই দৃষ্টি ঠিক রসদৃষ্টি নয়, কারণ ইহা normal বা সুস্থ নয়, তথাপি ইহা আর্টের পর্যায়ভুক্ত। জগদীশচন্দ্র ইহাতে ও যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তিনি যে একজন শক্তিশালী লেখক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

আদিম মানুষের এই অপ্রবুদ্ধ চেতনার ছায়া তাঁর ছোট গল্পসমূহে ওত-প্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। 'পয়োমুখমে' এক অতি বীভৎস চিত্র। কবিরাজ শ্বশুর পণ নিয়ে ছেলের বিয়ে দেয় আবার পুনরায় পণলাভের আশায় সেই নিরপরাধা বধূকে হত্যা করে। এমনি করে অনেক বধূকেই হত্যা করে চলে। কিছুটা অবাস্তব হলেও এর মধ্যে এক পৈশাচিকতা রয়েছে যা প্রত্যক্ষ করে আমরা শিহরিত হয়ে উঠি। 'পৃষ্ঠে শরলেখা' গল্পে ছেলের জন্য পাত্রী দেখতে গিয়ে পিতা সেই পাত্রীকেই বিয়ে করে আনে। আবার ছেলে সেই বিবাহিতাকে মা বলে ডাকে না বলে পিতা তাকে ভর্ৎসনা করে। 'লোকনাথের তামসিকতা', 'উর্মিলার মন', 'পামর', সব গল্পেই সুস্থ জীবনবোধ, স্বাভাবিক রীতিনীতি অনেকটাই বিপর্যস্ত রূপে বর্ণিত হয়েছে। মনে হয় প্রচলিত ও স্বাভাবিক জীবনধারণা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র সব বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছেন। এমন কি হাসির গল্প 'রাণী শান্তমনি', 'আঠারো কলার একটি' প্রভৃতিতেও একটা বাঁকা দৃষ্টি, একটা প্রচ্ছন্ন তিক্ততা যেন প্রকটিত হয়ে ওঠে। মনে হয় সমাজ ও তার অনুশাসন, বিধাতার রোষ, নিয়তির প্রতিকূলতা সব যেন নির্মমভাবে মানুষের শোষকের ভূমিকায়।

তবে, সজ্ঞান সমাজ-চেতনা বা বলিষ্ঠ কোন নীতি ও আদর্শ-সম্ভূত সংগ্রামী

মানসিকতা তাঁর লেখায় খুঁজতে গেলে বিফল হতে হবে। তিনি যে সব ম্লান মুখের ছবি এঁকেছেন, তাদের হতাশা-দুঃখ-দৈন্যের যে বিবরণ দিয়েছেন, তাদের যে অস্ফুট আশা আকাঙ্ক্ষা, অনুচ্চার কামনা বাসনাকে বাঙ্ময় করেছেন সে সবের কার্যকারণ সূত্র খোঁজেন নি। কি কারণে, কোন সমাজব্যবস্থার চাপে আজ এই অসহায়তা এবং ক্লেদাক্ত জীবন যাপন, তা নিয়ে নিজেকে বিব্রত করেননি। হয়ত এই জন্যই অতি অকালে তাঁর সাহিত্য সজীবতা ও সপ্রাণতা হারিয়ে ফেলেছিল। পরবর্তী যুগের লেখকেরা, তারাশংকর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে শুধু যে এই ধরনের চরিত্র ও পরিবেশ চিত্রণেই নিয়োজিত রইলেন তা নয়, সে সবের বিশ্লেষণ আরো ব্যাপক ও গভীরভাবে করে পাঠকদের মনে চিন্তার উদ্রেক করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর পাঠকবৃন্দ যারা কিছুটা সান্ত্বনা বা আশার আলো খুঁজতে চায়, তারা জগদীশ গুপ্তের লেখা থেকে কোন তৃপ্তি বা স্বস্তি লাভ করতে পারেন না। হয়ত এই কারণেই তিনি যতটা সাড়া ও কোলাহলের সৃষ্টি করেছিলেন সেই তুলনায় পাঠকচিত্তের সঙ্গে নৈকট্য স্থাপন করতে অসমর্থ হয়েছিলেন।

জগদীশ গুপ্ত সম্বন্ধে যেটা আমাদের সবচেয়ে বড় আফশোষ তা হল, নিজের প্রতিভা কিংবা ক্ষমতার প্রতি তাঁর চরম উদাসীনতা। আর একটু সজাগ ও সচেতন হলে হয়ত নিজের অবিন্যস্ত চিন্তাধারাকে আরো সুষ্ঠুরূপে উপস্থাপনা করতে পারতেন। এলোমেলো রচনারাশিকে একটা স্থির মতাদর্শে তথা জীবনবোধে পূর্ণ করা সম্ভব হত। কিন্তু তা হয়নি বলে অল্প কিছু দিনের মধ্যে তাৎক্ষণিক চমকের অবসানে রচনার ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে যেতে লাগল। কিছুদিন পরে হয়ত ঐতিহাসিক ও গবেষক মূল্য ছাড়া তাঁর সাহিত্যের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু এমনটি হবার কথা ছিলনা। কি ব্যক্তি মানুষের রহস্য উন্মোচনে, কি সমাজ জীবনের পঙ্কিলতা উদ্ঘাটনে জগদীশ গুপ্তের কৃতিত্ব সামান্য নয়। কিন্তু যে নিরলস সাধনা ও সুচিন্তিত কর্ম সাধনা থাকলে নিজের সৃষ্টিকে সুস্থিত করা যায় তারই প্রচণ্ড অভাব ছিল তাঁর মধ্যে।

জানিনা আরো ভবিষ্যতে সাহিত্যিকদের কোন পঙ্ক্তিতে তাঁর স্থান নিরূপিত হবে। আজ এই মুহূর্তে বলা যায়, কেবল ঐতিহাসিকতা নয়, গবেষকদের সতৃষ্ণ অনুসন্ধিৎসা মেটানোও নয়, এসব ছাড়িয়ে তাঁর রচনার দীপ্তি ও তেজস্বিতা আমাদের কম মুগ্ধ করে না। সাহিত্যের আকাশে জগদীশ গুপ্ত সূর্য কিংবা চন্দ্র হয়ত নন; তাই বলে গোধূলির অন্ধকারে উড্ডীয়মান খদ্যোৎও তাঁকে বলা সংগত হবে না। বরং গোধূলিলগ্নে সাহিত্যাকাশের নিভৃত এক প্রান্তে তিনি দূরাবস্থিত সন্ধ্যাতারার মতই আপন বৈশিষ্ট ও স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল।

রমেশচন্দ্র সেন (১৮৯৪-১৯৬২)

পঞ্চাশ বছর পার হবার পর রমেশচন্দ্র সেনের প্রথম উপন্যাস 'শতাব্দী' প্রকাশিত হয়। এবং প্রথম উপন্যাসেই তিনি যে বলিষ্ঠতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তা অনেকেরই সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মনে করা গিয়েছিল পরবর্তী প্রজন্মে তাঁর সাহিত্যকৃতি নিয়ে অনেক সবিস্তার আলোচনাই হবে। পরের উপন্যাস 'কুরপালা'তে তাঁর সৃজনশীল মৌলিকতা আরো ব্যাপক ও গভীর এবং কয়েকটি ছোট গল্পে তিনি যে অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়েছেন তাতে মনে হওয়া কষ্টসাধ্য যে এত স্বল্প কালের ব্যবধানেই তিনি বিস্মৃতিতে ডুবে যাবেন। হয়ত জীবদ্দশায় তিনি বিশেষ স্মৃত ছিলেন না বলেই এই বিস্মৃতি এত অকালে গ্রাস করে ফেলেছে তাঁর সাহিত্যিক অভিধাকে। অস্বীকার করার উপায় নেই, যে কয়জন সাহিত্যিক উপন্যাসের ব্যাপ্তি ও মৌলিকতায় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, গতানুগতিক ছক-বাঁধা রীতি প্রকরণ বিসর্জন দিয়ে উপন্যাসকে সম্পৃক্ত করেছেন দেশ ও কালের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে, সকল অতীত সংস্কৃতি ও আদর্শের বন্ধন ছিন্ন করে নতুন চিন্তা ও ভাবনায় প্রবাহিত করেছেন বাংলা উপন্যাসকে, রমেশচন্দ্র সেন তাঁদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থানলাভের অধিকারী।

বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পিঞ্জরীতে তাঁদের আদি বাসস্থান হলেও রমেশচন্দ্র জন্মেছিলেন কলকাতায় বাংলা ১৩০১ সালে। কলকাতাই ছিল কর্মক্ষেত্র। প্রথম জীবনে পিতার কাছে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করেন। পরে হাতিবাগানের পণ্ডিত সীতানাথ সাংখ্যতীর্থের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শাস্ত্র, ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। এই সময় প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করে সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৯১২ সালে ইংরাজীতে অনার্স সহ বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন বি.এ পরীক্ষায়। পিতার মৃত্যুর জন্য পড়াশুনা আর এগোয় নি। এম এ ক্লাসের পড়া বন্ধ করে পৈতৃক পেশা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাতে নিযুক্ত হলেন। কিন্তু সাহিত্যের সংগে যোগ ছিল বরাবর। ১৩১৮ সালে সাহিত্য সেবক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে অন্যান্য অনেক সাহিত্যিকের সংগে তিনিও

লিখিত গল্প ও রচনা নিয়মিত পাঠ করতেন। বিভিন্ন মাসিক ও সাপ্তাহিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর রচনাদি প্রকাশিত হলেও পূর্ণ সাহিত্যিক মর্যাদা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন ১৩৫২ তে শতাব্দী উপন্যাসের মাধ্যমে। এর পর প্রকাশ পায় কুরপালা, গৌরীগ্রাম, চক্রবাক্, মালঙ্গীর কথা, কাজল, পূব থেকে পশ্চিম, সাগ্নিক ও অনেক ছোট গল্প। কোন কোন গল্প বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। সাহিত্য সাধনার সমান্তরালভাবেই চলে জীবিকার জন্য চিকিৎসা ব্যবসায়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তির জন্য ১৯১৮-১৯ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত আয়ুর্বেদ সম্মেলনে আমন্ত্রিত হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। ঐ সম্মেলনে তিনি সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন এবং প্রতিভার স্বীকৃতি হিসাবে লাভ করেন বিদ্যানিধি উপাধি। কর্মজীবন বলতে এই, চিকিৎসা ও সাহিত্য সাধনা। অবশ্য অপ্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন, তবে তা নিতান্তই গৌণ।

তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে যা কালোত্তীর্ণ বলে গণিত হবে তা হল শতাব্দী, কুরপালা, কাজল উপন্যাস এবং কয়েকটি অসাধারণ ছোট গল্প। বাস্তব জীবনে কর্মজগতে বিশেষ বৈচিত্র্য তাঁর ছিল না। কিন্তু চিকিৎসক হিসাবে ধনী দরিদ্র, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য, অভিজন অভাজন সব স্থানেই তাঁর গতায়াত ছিল, আর চোখ কান খোলা রেখে, সংবেদনশীল হৃদয় ও বিচার বোধকে মুক্ত রেখেই তিনি জীবনকে দেখেছেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতীতি ও সুগভীর ইতিহাস চেতনা। এ সবেরই সংমিশ্রন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে।

শতাব্দীর ব্যঞ্জনা অনেকটা এপিকধর্মী। গত শতকের শেষভাগ থেকে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত এর কাহিনীকাল বিস্তৃত। রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ, অর্থনৈতিক ক্রমবিবর্তন এবং সেই সঙ্গে পুরাতন মূল্যবোধ ও দৃষ্টি ভঙ্গির বদলে নবসঞ্জাত নীতি আদর্শ এসব ভিন্ন ভিন্ন স্তরে রূপায়িত হয়েছে। জমিদারী প্রথার ক্রমবিলোপ, শিল্পবাদের উন্মেষ ও বিস্তার, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ ও গণচেতনার উন্মেষ, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের গতি প্রকৃতি সব কিছুই নিটোলভাবে কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। কিন্তু কোন সোচ্চার প্রকাশ বা উচ্চকণ্ঠ নিনাদ শোনা যায় না। সবই যেন অতি স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ গতিময়। বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনা, নানা স্বভাবের বহু বিচিত্র মানুষজন ও তাদের কার্যকলাপ বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত কিন্তু একটি সুসমঞ্জস, সুসংহত ঐক্যের

গ্রন্থিতে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। মহাকাব্যের বিশালতা নিয়েই যেন এর গতি ও পরিণতি। এর পটভূমি বিরাট ও বিস্তৃত, বাঙালী জীবনের সীমাবদ্ধতা ও দৃষ্টির কূপমণ্ডূকতার বাইরে এই উপন্যাসের অবস্থান। উপন্যাসের প্রারম্ভিক পর্যায়ে জাতীয় মহাসভার বিবরণ, এর কার্যাবলী ও গণমানসে প্রতিক্রিয়া নিয়ে সবিস্তার ও সুদীর্ঘ বর্ণনা, এই ইতিহাস অনেকটা নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়েই লেখা। এর পর কাহিনী গড়িয়ে চলে পুঁজিবাদ ও ধনতন্ত্রের উন্মেষ ও বিকাশের ধারা বেয়ে এবং অনিবার্যভাবেই এসে যায়—সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের কথা। উঁচুতলার মানুষের অব্যাহত শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বিশেষ রূপ হয়ত দেখতে পাওয়া যায় না কিন্তু যে অসন্তোষ ও ক্ষোভ সাধারণের মনে অংকুরিত হতে থাকে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়; যাকে সঠিক গণ-আন্দোলন বলা যায় তার পরিণত রূপ এই উপন্যাসে ব্যক্ত না হলেও সেই সম্ভাবনার অংকুর দেখা যায়। সোলেমান ও অনন্ত শাস্ত্রীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে প্রতিবাদের আন্দোলন কিন্তু তা ছড়িয়ে পড়ে না সকলের মধ্যে। তারা উপলব্ধি করে কিন্তু সক্রিয় হয়ে ওঠে না। হয়ত এই উপন্যাসের পরিণতি এর বেশী এগিয়ে নিয়ে যেতে লেখক চান নি, পাঠকের উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার জন্য। যে সামন্ততন্ত্রের ভাঙনের ইতিহাস তারাশংকরের উপন্যাসে অংকুরিত হয়েছিল, গণচেতনার প্রথম আভাস পাওয়া গিয়েছিল, রমেশচন্দ্র সেনের উপন্যাসে তার পরের ধাপটিও উন্মোচিত অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের স্থানে পুঁজিবাদ ও ধনতন্ত্রের আধিপত্য। এবং এরই ফলে সমাজে যে অবক্ষয় তারই বাস্তবনিষ্ঠ রূপায়ণ বিবৃত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে।

পূর্ববঙ্গীয় নমশূদ্রের জীবন, তাদের দৈনন্দিন আচার আচরণ ও মানসিকতাকে কেন্দ্র করে 'শতাব্দীর' কাহিনী রচিত হলেও তা বৃহত্তর জাতীয় জীবনের রূপালেখ্য হয়ে উঠেছে। অতি সাধারণ চাষী রাজেশ্বর নিজের চেষ্টা ও কর্ম-দক্ষতায় হয়ে ওঠে পুঁজিপতি। রাজেশ্বরের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় অবহেলিত তফশীল সম্প্রদায়ের জেগে ওঠার বাসনা। যে অনাদর, অবহেলা লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা প্রতিনিয়ত এই সম্প্রদায়কে আমরণ ভোগ করতে হত তারই বিরুদ্ধে যেন অভিযান। উচ্চবর্ণের একদা বিত্তশালী সম্প্রদায় আজ ক্ষয়িষ্ণু। তাদের সম্বল প্রায় শূন্য অথচ চিরাচরিত অহংকার ও দাম্ভিকতা মজ্জাগত। তাই শোষণের ধারাও অব্যাহত। এই শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে গ্রামের চাষীরা অসন্তোষ

জানায়, প্রতিবাদ করে, যদিও প্রতিকারের উপায় সঠিক জানা নেই। রাজেশ্বর এদের প্রতিনিধি, আচারে কথায় একটা প্রতিবাদী সুর। জাতিভেদ প্রথার জন্য বংশ পরম্পরায় যারা কেবলই শোষিত, নিজেদের প্রাপ্য অপ্রাপ্য সম্বন্ধেও অজ্ঞ, তাদের মনে আজ সে নতুন উপলব্ধি, নতুন চেতনা তাই রাজেশ্বরের কণ্ঠে ধ্বনিত। এই জাগরণ রাজেশ্বরের ক্রম-উত্থানের মধ্য দিয়ে নির্দেশিত হয়েছে। তার দৃঢ়তা, ও বলিষ্ঠতার সংগে মিশেছে কয়েকটি মানবিক গুণ। অন্যের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাওয়া, বিপদের সময় সকলকে আশ্বাস দেওয়া প্রভৃতি যুক্ত হয়েছে তার অদমনীয় কর্মক্ষমতা ও প্রখর উপস্থিতবুদ্ধির সংগে। সব বিষয়ে নেতৃত্ব দেবার অধিকারী ছিল সে।

রাজেশ্বরকে কেন্দ্র করেই এই অভ্যুদয় তাই এই মুখ্য চরিত্রটি বিশেষভাবেই অংকিত। কিন্তু অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্রগুলিও নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে উজ্বল। বৃন্দাবন, জবা, বৃদ্ধা জাহানারা, চাঁপা—অতি সাধারণ সব চরিত্র কিন্তু যেহেতু তারাও এখানকার মানুষ তাই তাদেরও একটা নিজস্বতা রয়েছে। লেখক সামান্য আঁচড়েই এদেরকে মূর্ত ও জীবন্ত করতে পেরেছেন। বৃদ্ধা জাহানারার বার্ধক্যের যন্ত্রণা অথচ সকলের প্রতি অসীম দরদ ও সহানুভূতি, স্বামীর প্রতি রাগ অনুরাগ এক কথায় অপূর্বভাবেই চিত্রিত করেছেন লেখক। বাঙালী মেয়েদের যে বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র মনোভাব তা সম্পূর্ণভাবেই ফুটে উঠেছে, জাহানারার চরিত্রে। আর বৃন্দাবনও লেখকের সহানুভূতিতে উজ্বল হয়েই পরিস্ফুট। তার কথাবার্তা বা মনোভাবে সে যেন নতুন যুগেরই প্রতিনিধি। কোন সংস্কার বা গোঁড়ামি তাকে আচ্ছন্ন করেনি।

নায়িকা চাঁপা, কিন্তু চলতি উপন্যাসের নায়িকাসুলভ গুণের অধিকারিণী সে নয়। তার রূপ আছে আর সেই জন্য গর্বও আছে। স্বামীর সোহাগে সে বঞ্চিতা নয়। কিন্তু কোন অসাধারণত্ব আরোপ করা হয়নি বলে অতি স্বাভাবিক ও সহজ বলেই মনে হয়। এরই পাশে রয়েছে টগর, অনেকটা বিপরীত স্বভাবের। কিন্তু দুটি চরিত্রই মূর্ত ও সজীব, গ্রাম্যতার সংগে নাগরিকতার কিছুটা ছোঁয়া লেগেছে, স্বভাব-সারল্য কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে নাগরিকতার ছোঁয়ায়, কিন্তু গ্রামের পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণই মানানসই।

এই উপন্যাসের মানুষগুলি গ্রাম থেকে শহরের দিকে ধাবমান। এই ধাবমানতার মধ্যে নিহিত রয়েছে সামন্ততন্ত্রের ক্রম-বিলীয়মান অবস্থা আর সেই

সংগে পুঁজিবাদের আবির্ভাবের স্পষ্টরেখা। চলমান জীবন, ততোধিক চলমান সময়। এই চলার স্পন্দন শোনা যায় উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে— যে নীতি ও আদর্শ জীবনকে খণ্ডিত ও ক্ষুদ্র করে রেখেছিল, বিচ্ছিন্ন করেছিল পরিবর্তনশীল পৃথিবীর মূল স্রোত থেকে, তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অভিযান শুধু কয়েকটি কথার মধ্য দিয়ে নয়, সকল মানুষের আচরণ ও অভিব্যক্তির মধ্যে। আর গোটা কাহিনী জুড়েই স্পন্দিত এই গতি। নতুন স্রোতে সামিল হবার সংকল্প।

'কুরপালা' এ দিক থেকে আরো অগ্রসর, আরো গতিময়, অধিক তাৎপর্য-মণ্ডিত। এর মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ নায়ক হয়ে দেখা দেয় নি। সকল মানুষ, তাদের কর্মোদ্যোগ ও প্রয়াস সম্মিলিতভাবে নায়কের স্থান দখল করে নিয়েছে। পরিকল্পনার এই মৌলিকত্ব, এই অভিনবত্ব উপন্যাসটিকে একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা দিয়েছে। পাশাপাশি দুটি গ্রামের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে কাহিনীর সূত্রপাত যা ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে জাতীয় সংগ্রামের গতি ও পরিণতির প্রকাশ সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করেছে। কুরপালা আর রাণীডাঙা পাশাপাশি দুখানি গ্রাম। কুরপালার অধিকাংশ মানুষই জেলে, জোলা, মজুর, চাষী যাদের জীবিকা চাষ-বাস নয়তো মাঝিগিরি। রাণীডাঙার অধিবাসী শিক্ষিত ও ভদ্রলোক। রাণীর খালের উপর রাণীডাঙা। একশ বিঘার একটি চাষযোগ্য জমি নতুন ভাবে জেগে উঠেছে আর এটারই মালিকানা নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত। কৃষাণ মেহের আলী, তুলসী কাহার, যদু নাপিত, অশ্বিনী, জগু সর্দার, যোগেশ ও ভজহরি একদিকে, অন্যদিকে হঠাৎ বড়লোক হওয়া বঙ্কিম। এই নতুন পুঁজিবাদী বঙ্কিম ধীরে ধীরে বন্ধকী কারবারের মধ্য দিয়ে আত্মসাৎ করে চলেছে রাণীডাঙার জমিদার রামেন্দ্র রায়ের সর্বস্ব। রামেন্দ্র রায় প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ, আর বঙ্কিম পুঁজিবাদের প্রতিনিধি। তাই বঙ্কিমের এই ক্ষুধা ও লোলুপতার মধ্যে পুঁজিবাদের আগ্রাসন সুস্পষ্টভাবেই চিহ্নিত। রামেন্দ্র রায়ের চেহারায়, চলায়, বলায়, বাড়ীর আসবাবে, বৈঠকখানার শোভায় এক বিলীয়মান আভিজাত্যের ছাপ, অনেক কষ্ট করেও সেই আভিজাত্য আর বনেদী মেজাজ টিকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। শতরঞ্জি আর গালিচার রং বিবর্ণ, মলিন। বাড়িঘর ভেঙে পড়ার উপক্রম, কিন্তু নতুন করে সাজাবার সংগতি নেই। এরই পাশে নতুন বিত্তবান বঙ্কিমের রমরমা বন্ধকী কারবার। প্রায় গোটা কুরপালা তার কবলে, তারই উদ্যোগে

প্রতিষ্ঠিত হয় বৃহৎ শিল্প, কারখানা আর মিল। রূপমতীর পারের সমস্ত জমিই সে দখল করে নিয়েছে প্রজাসত্ত্ব পেয়ে। জাহাজ বোঝাই হয়ে আসে বঙ্কিমের কলকব্জা, কুরপালায় চলে যন্ত্রের দাপট, নতুন পুঁজির বিজয় অভিযান। দেখা দেয় জলের অভাব, চাষীদের মধ্যে জাগে দুর্ভিক্ষের শংকা। বাঁধ কাটলে হয়ত জল পাওয়া যায় কিন্তু বাধা দেয় বঙ্কিম। তার উদ্দেশ্য বাঁধের সংলগ্ন জমিগুলির দখল কায়েম করা। প্রবল প্রতিপক্ষ বঙ্কিমের অর্থবল আর সেই সঙ্গে কিছুটা জনবলের কাছে হার মানে চাষীরা। কুরপালার চাষীরা হঠাৎই যেন ভূমিহীন হয়ে গেল। সব হারিয়ে তারা বঙ্কিমের কাছে আসে কারখানায় চাকরী পাবার আশায়। কিন্তু চাকরী না পেয়ে যখন তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তখনই ভাড়া করা লোক আর নেপালী দারোয়ানের আঘাত নেমে আসে তাদের উপর, ভূমিহীন, নিঃস্ব রিক্ত, চাষী মজুরের রক্তে রাঙা হয় একদা শান্ত স্নিগ্ধ কুরপালার মাটি। কিন্তু শোষণ আর অত্যাচারই তো শেষ কথা নয়। আঘাত যারা চিরদিনই সহ্য করে তারাও একদিন আঘাত হানার জন্য প্রস্তুতি নেয়, কখনো দলবদ্ধভাবে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে, আবার কখনো বা সরাসরি আঘাত হেনে।

এখানেও দলবদ্ধভাবে প্রতিবাদের, প্রতিরোধের, পাল্টা আঘাতের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় যখন রাজনৈতিক আন্দোলনের ছোঁয়া এসে লাগে। রামেন্দ্র রায়ের জ্ঞাতিভাই বিশ্বনাথের ছেলে শংকর এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিল। শংকর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। কিন্তু চাকরী ত্যাগ করে সে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করে এবং এবং কুরপালা ও রাণীডাঙার তরুণ ছাত্রসমাজ এগিয়ে এল তার অধিনায়কত্বে। তখন সারা দেশ জুড়ে চলছে কংগ্রেসের বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন। সেই আন্দোলনেরই প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় কুরপালা আর রাণীডাঙায়। সকলকে আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানায় তরুণ নেতা শংকর। এগিয়ে আসে এরফান, নারায়ণ, ভজহরি, বিষ্ণু চাটুজ্জে, রামলাল, হিরণ সেন, মেহের আলি, লতিফ মিঞা প্রভৃতি। গ্রামের আকাশ বাতাস জুড়ে ধ্বনিত হয় বন্দেমাতরম। যেন নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে সকলের মনে, সকলের ভাবনায়। কেউ যেন আর পিছিয়ে থাকতে চায় না। অবিরাম চলে মদের দোকানে পিকেটিং, চরকার কাজ, বিদেশী দ্রব্য বর্জন। শুধু তরুণের দলই নয়, প্রবীণ ও মান্য ব্যক্তিরাও যোগ দেয় এই

আন্দোলনে, কর্মযজ্ঞে। অপরদিকে শুরু হয় যথারীতি সরকারী দমন পীড়ন, ১৪৪ ধারা, অত্যাচার, জেল জরিমানা। আন্দোলনকে স্তিমিত করার জন্য সরকারী তরফে নানা ফন্দি ফিকির শুরু হয়, যার অন্যতম হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস। কিন্তু আন্দোলনের বিরাম হয় না। বঙ্কিমবাবু ও তার দলবল প্রচুর অর্থ লাভ করে ব্যবসার মাধ্যমে, সরকারের পক্ষ নিয়ে গরীবের ঘরে আগুন লাগায়। হয়ত সাময়িকভাবে লোকের মধ্যে ভীতি বা হতাশার সৃষ্টি হয়। কিন্তু শঙ্কর আর তার অনুগামীরা অনির্বাণ দীপ নিয়ে এগিয়ে যায় পথের সন্ধানে। এই গণজাগরণ, গণঅভ্যুত্থান, নতুন চেতনা ও উপলব্ধিই হল কুরপালার মূল সুর।

প্রতিটি চরিত্রই অতি বাস্তব ও স্বাভাবিকভাবে ফুটে উঠেছে। কোথাও কোন অসংগতি অতিরঞ্জন এসে এই উপন্যাসের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ণ করেনি। যদু নাপিত, অশ্বিনী, জগু সর্দার, ইউসুফ, আলি মেহের, এরফান, হাস্য, পদ্ম, ভজহরি, যোগেশ এমন অসংখ্য চরিত্র, কারো ভূমিকাই প্রধান নয়। অবার কেউই অতিরিক্ত নয়, সকলেই অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে রয়েছে মূল স্রোতের সঙ্গে। শঙ্কর, বিষ্ণু চাটুজ্জে কিংবা রামেন্দ্র রায়, বঙ্কিম সকলেই অতি স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক। কৃত্রিমতার দোষে দুষ্ট নয়। ভগবান পুরোহিত তার সংস্কার আচার, আচরণ ও অন্ধবিশ্বাস নিয়ে অতি জীবন্ত হয়েই দেখা দেয়।

নারীচরিত্রের মধ্যে রয়েছে হাস্য, সরোজিনী দেবী, জাহ্নবী দেবী, ক্ষান্ত, পদ্ম প্রভৃতি। আমাদের অতিপরিচিত পরিবেশের প্রতিনিধি এরা। ক্ষমা ও ধৈর্যের স্নিগ্ধ রূপলাভ করেছে জাহ্নবী ও সরোজিনীর মধ্যে। মাতৃস্নেহে উদ্ভাসিতা সরোজিনী আর আত্মসম্মানবোধ সম্বলিতা জাহ্নবী দেবীর চরিত্র দুটি খুবই উজ্জ্বল রূপে চিত্রিত। হাস্যের চরিত্রও অতি সূক্ষ্মভাবে বর্ণিত হয়েছে। শঙ্করের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ তার ছিল কিন্তু ঘটনার প্রবাহে সেই প্রেম কখনো প্রকাশিত হয়নি কারণ এই রোমান্টিক হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে মনোনিবেশ করার সময় ও মানসিকতা শঙ্করের ছিল না। তবে নারায়ণ হাস্যকে পাবার জন্য অধীর ও উন্মুখ হয়েছিল। তার আচরণ অনেক সময় নির্লজ্জভাবে প্রকটিত হলেও অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। সেদিক থেকে নারায়ণের চরিত্রটিও জীবন্ত।

শতাব্দী ও কুরপালা যেন একে অন্যের পরিপূরক। দুটিতেই

ইতিহাসানুবর্তিতা, বাস্তবানুসরণ ও যুগ চেতনার সম্যক স্ফুরণ হয়েছে। এই উপন্যাস দুটির অন্যতম উল্লেখ্য হল চরিত্রগুলির মুখের ভাষা। পূর্ববঙ্গের ভাষাকে এমন প্রাধান্য খুব কম উপন্যাসে বা গল্পেই দেওয়া হয়েছে। যেহেতু একটি বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই কাহিনী বিস্তার লাভ করেছে, তাই সেই অঞ্চলের ভাষাই মুখ্য স্থানের দখল নিয়েছে। এরফান, ইউসুফ, যদু-নাপিত বা ভগবান পুরোহিত যদি শিক্ষিতদের ভাষায় কথা বলত তবে তারা এত প্রাণময় বাস্তব হয়ে উঠত না। সাধারণত এক আধটা চরিত্রের মুখে আমরা আঞ্চলিক বা পূর্ববঙ্গীয় ভাষা শুনতে পাই তাদেরকে বিশেষ টাইপ বা হাস্যকর করে তোলার জন্য। কিন্তু গুরুগম্ভীর চরিত্র, গুরুভার সব ঘটনার মাঝেও যে অনর্গল এই ভাষা ব্যবহার করে গেছেন সেটা লেখকের কৃতিত্ব ও সাহসেরই পরিচয় দেয়। কুনো বৃন্দাবন জটাই, বৃদ্ধা জাহানারা এত সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছে এই ভাষা প্রয়োগের ফলেই। প্রচলিত গ্রাম্য ছড়া ও প্রচলিত গ্রামের গান এমনভাবে ব্যবহার করেছেন লেখক যে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অকৃত্রিম ও সম্পূর্ণ গ্রামীণ হয়েই পরিস্ফুট। তা ছাড়া এই ভাষা উপন্যাস দুটিতে গতি সঞ্চারেও সাহায্য করেছে। আবার লেখক যেখানে কোন ঘটনার বিবরণ বা ইতিহাসের উল্লেখ করেছেন সেখানে গম্ভীর ও মার্জিত ভাষাই ব্যবহার করেছেন। ভাষার এই সুষ্ঠু প্রয়োগের ফলে শতাব্দী ও কুরপালা এত স্বাভাবিক ও সচল।

এই উপন্যাস দুটির পরেই নাম করতে হয় রমেশ চন্দ্রের আরেকখানি উপন্যাস 'কাজল'। পতিতাদের নিয়ে কাহিনী, তাদের দুঃখ, যন্ত্রণা, বেদনা ও বঞ্চনার ইতিহাস। শোনা যায় একটি পতিতার চিকিৎসা করার সময় তিনি এদের জীবনযাত্রা, আদি ইতিহাস, কুৎসিত জীবন ও করুণ পরিণতি সম্বন্ধে সম্যক অবহিতি লাভ করেন। পতিতা জীবন নিয়ে অনেক গল্প ও উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে লেখা হয়েছে। তবে সে সবের বেশীর ভাগই রোমান্টিক ভাবালুতা সমৃদ্ধ। পতিতাদেরও প্রাণ আছে, মন আছে, বিবেক আছে, রয়েছে সুস্থ ও সুন্দরভাবে বাঁচার তাগিদ, এসব নিয়ে অনেক কল্পিত কাহিনীর সংগেই আমরা পরিচিত। কিন্তু গোটা পতিতা সমাজ নিয়ে এমন কাহিনী, যা একাধারে ইতিহাস ও সামাজিক দর্পণ, বোধ হয় আর কেউ রচনা করেনি। কারণ পেশাগত দিক থেকে, জীবনযাত্রার মানদণ্ডে এরা আমাদের একান্ত পরিত্যাজ্যই ছিল কিন্তু রমেশচন্দ্র সেন এদের সমস্যার গভীরে আলোকপাত

করেছেন, মরমী ও দরদী মন নিয়েই এঁকেছেন এদের দিনলিপি। প্রায় দুশো বছরের ইতিহাস গ্রথিত হয়ে রয়েছে এই উপন্যাসে। তাঁর চিকিৎসক জীবনের অন্যতম সঞ্চয় ও সৃষ্টি এই কাজল উপন্যাসে সার্থক হয়েই প্রতিভাত। এছাড়া তাঁর অন্যান্য উপন্যাসেও স্বতন্ত্র মৌলিকতা রয়েছে কিন্তু শতাব্দী বা কুবপালার মত তা কোন মহৎ সৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত নয়। অনেকটাই গতানুগতিক, লেখার জন্যই লেখা, জীবন ও জগৎ, দেশ ও সমাজের প্রকৃত আলেখ্য নয়। অবশ্য দু-একজন ছাড়া কালজয়ী উপন্যাস একজনের কাছ থেকে অধিক সংখ্যায় আশা যায় করা না। তাঁর জীবনের উপলব্ধি, বোধ, অন্বেষা, প্রেরণা সব কিছুই উৎসারিত হয়ে দেখা গেল শতাব্দী ও কুরপালাতে, কিছুটা কাজল উপন্যাসেও। অবশ্যই জীবনসন্ধানী রমেশচন্দ্রকে পাওয়া যাবে তাঁর কয়েকটি অনবদ্য ছোট গল্পে।

বাংলা সাহিত্যের যে কয়টি শাখা খুবই উন্নত, এমন কি বিশ্বমানের, ছোটগল্প তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান আধকার করে, যদিও এর আবির্ভাব অন্য সকলের চাইতে অনেক পরে। অসংখ্য লেখক অসংখ্যতর বিষয়বস্তু নিয়ে ছোট গল্পের আয়তন বৃদ্ধি ও মান উন্নত করেছেন। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে সে সামগ্রিক ও একনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী, অর্জিত অভিজ্ঞতা ও উচ্চাঙ্গের কল্পনা শক্তির প্রয়োজন তা হয়ত অনেকের মধ্যেই পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে না। কিন্তু ছোট গল্প ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনা ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ নরনারীর মনের সাময়িক আলোড়নকে নিয়েও রচনা করা যায় বলে অনেকেই এতে সিদ্ধিলাভ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে সফল, সার্থক ও কালজয়ী উপন্যাসের স্রষ্টা যেমন বিস্ময়করভাবে কম, তেমনি অতি অখ্যাত অল্পখ্যাত লেখকের সার্থক ছোট গল্প অসংখ্য, নামকরা সাহিত্যিক-দের তো কথাই নেই।

রমেশচন্দ্র সেন কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সফল, যদিও লোকপ্রিয়তায় অনেকের চাইতেই পিছিয়ে। শতাব্দী ও কুরপালার মত বিশাল ও সার্থক উপন্যাসের লেখকের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি অসাধারণ কয়েকটি ছোট গল্প যা বিষয়-বস্তুর অভিনবত্বে, পাত্রপাত্রীর নগণ্যতায় ও উপলব্ধির গভীরতায় আমাদের আচ্ছন্ন করে। সমাজের অন্ত্যজ, অপাংক্তেয়, অনুন্নত ও অস্পৃশ্যদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক ছোট গল্প সৃষ্ট হয়েছে কিন্তু রমেশচন্দ্র বোধ হয় তাঁদের সকলকে ছাপিয়ে গেছেন আরো ক্ষুদ্র আরো অপাংক্তেয়দের সাহিত্যে স্থান করে।

দিয়ে। অনেকেই এদের সমস্যা, সামাজিক পরিস্থিতির ফলে উদ্ভূত অসহায়তা নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ ও আদর্শ নিয়ে এদের জীবনে আলোকপাত করেছেন কিন্তু রমেশচন্দ্র সেনের মত এত নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে এদের চরিত্র-চিত্রণ করেছেন কিনা সন্দেহ, অথচ তাঁর সহানুভূতি ও মমত্ব কোথাও প্রচ্ছন্ন নয়। এদের সুখ দুঃখের ঘটনা ও অনুভূতির সঙ্গে লেখকও মিশিয়ে দিয়েছেন নিজের করুণা ও বেদনা। আবার অতি করুণ ও নগ্ন সেই সব ঘটনা ও চরিত্র উদ্-ঘাটনের মধ্য দিয়ে তাঁর মানবতাবোধ ও সূক্ষ্ম রসানুভূতি কোথাও যেন বাধা-প্রাপ্ত হয় নি। তবুও যে তাঁর ছোট গল্প বিশেষ খ্যাতি লাভ করে নি, তার একটা প্রধান কারণ, হয়ত এই সব অন্ত্যজ অস্পৃশ্যদের আমরা এড়িয়ে চলি, পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা এদের প্রতি সহানুভূতি আনার চেষ্টা করি কিন্তু একেবারে মুখোমুখি হতে দ্বিধা করি, সংকোচ বোধ করি।

মুচি, মেথর, ডোম, কানা-খোঁড়া ভিখারী প্রভৃতি যেভাবে তাঁর ছোট গল্পে স্থান পেয়েছে তা বিস্ময়কর। তাছাড়া মাঝি মাল্লা, চাষী মজুর তো রয়েছেই। এবং সকলেই যেমন নিজ ব্যক্তিসত্তা নিয়ে উপস্থিত, তেমনি তাদের শ্রেণীরও প্রতিনিধি। তবে কোন উচ্চ নিনাদিত প্রতিবাদ, রাজনীতির প্রভাব বা মত ও আদর্শের কচকচি এদের মধ্যে নেই। লেখক শুধু এদেরকে, এদের বিভিন্ন ঘটনা ও অভিঘাতকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন, নিজের বক্তব্য ও মতবাদকে সম্পূর্ণ অনুচ্চার রেখে। উপন্যাসের ক্ষেত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে এনেছেন সংকুচিত ক্ষেত্রে কিন্তু ঔপন্যাসিকের নিরাসক্তি ও নির্লিপ্তি নিয়ে। ছোট গল্পে যে গীতিকবিতার সুর, মন্ময়তা ও আত্মলীন অভীপ্সা আমরা দেখতে অভ্যস্ত, সেখানে লেখকের বিশেষ জীবনদর্শন ও দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে চরিত্রগুলি প্রাণময়তা লাভ করে রমেশচন্দ্রের রীতি তার চাইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একটি বক্তব্য, একটি ঘটনা, সামান্য কোন পুরুষ বা নারী যেন ভাস্করের মত খোদাই করেছেন। শিল্পীর তুলির পেলবতার বদলে ভাস্করের ছেনি বাটালির কঠিন কারুকার্যই প্রবল।

পদ্মা বাঙালীর মেয়ে। বিয়ে করেছে ভৈরো চামারকে। হাজারীবাগের ভৈরো চামারের সঙ্গে কি করে পদ্মার বিয়ে হল তা কারো জানা নেই। এই চামার দম্পতির রুক্ষ কঠিন অমার্জিত ও আশালীন জীবন যাত্রা নিয়ে রচিত হয়েছে 'পদ্মা' গল্প। চামারদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার প্রণালী কয়েকটি বাক্যে

ফুটে উঠেছে, অতি সীমিত কিন্তু সানুপুঙ্খভাবে, "এই গলিতে কতকগুলি চামারের বাস। ছোট্ট একখানা মাটির ঘরে আটদশজন মিলিয়া বাস করে। সেই ঘরে বসিয়াই তারা জুতা সেলাই করে, জুতাওয়ালাদের সঙ্গে দেনা পাওনা বুঝিয়া লয় এবং কাজ করিতে করিতে ভিজা চামড়ার পাশেই ভাতের থালা লইয়া আহার করিতে বসিয়া যায়। আহারান্তে চাটাই পাতিয়া সেই ঘরেই শুইয়া পড়ে।' সকলেরই দেখা এই চিত্র কিন্তু অল্প কয়েকটি কথায় চামারদের এই জীবন যেন নতুন করে আমাদের চিনিয়ে দেয় অতি পরিচিত সব মুখগুলিকে। আর এদের জীবনযাপন সম্বন্ধে শুনি, "ভৈরো প্রত্যহই মদ খাইয়া বাড়ী ফেরে। আজ মদের মাত্রা কিছু বেশী হইয়াছে। তাই পম্মাকে প্রহারও কিছু গুরুতর হইয়া পড়িল। তারা দুইজনে এইরূপ ঝগড়া ও মারামারি করিয়া পাড়াটাকে কিছুক্ষণ সরগরম করিয়া রাখিল। পাড়ার লোকেরা কেহ এ ঝগড়ায় বাধা দিতে কিংবা সহানুভূতি প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইল না। অনেক বৎসর যাবৎ এ কান্ডই শুনিতে তারা অভ্যস্ত। এ ঘটনা নতুন কিছু নয়।" কিন্তু আমাদের কাছে অনেকটাই নতুন, কারণ আমরা জানি বটে কিন্তু চোখের সামনে এমনভাবে প্রত্যক্ষ করি না। এই মারামারি, ঝগড়া, বিবাদ ভৈরো ও পম্মার বাইরের রূপ। ভিতরে রয়েছে উভয়ের প্রতি উভয়ের দুর্বার আকর্ষণ ও ভালবাসা। তাই পম্মা যখন মার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন দেখি, "ভৈরো তার বিছানার পাশে বসিয়া দিবারাত্র অবিশ্রান্ত সেবা করিয়াছে। ডাক্তার ও ঔষধের জন্য খরচা করিতে কোন কার্পণ্যই করে নাই। এমন কি এই দেড় মাস মদের দোকানের দিকেও যায় নাই।

পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ ও মানসিক ক্লান্তির জন্য ভৈরোর চেহারা বড় খারাপ হইয়াছিল। তার জন্য পম্মার বড় চিন্তা হইল। সে বলিল, 'তুই যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছিস, মিন্সে'। ভৈরো উত্তর করিল, 'ভাগ্যিস তোকে পোড়াবার কাজে লেগে যাই নি। বলিয়াই হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই ভাবে অসুখের পর দুজনে দুজনকে নতুন করে ভালবাসতে শুরু করল কিন্তু ভৈরোর জীবনে এল অদ্ভুত পরিবর্তন। আগের মত পম্মাকে মারে না, গালিগালাজ করে না, এমন কি মদ খেয়েও মাতাল হয় না। এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনে কিন্তু পম্মার মনের শান্তি বিঘ্নিত হল। তার ধারণা ভৈরো আগের মত আর তাকে ভালবাসে না। সে অন্য নারীতে আসক্ত। সুতরাং ভৈরোকে

আগের মূর্তিতে ফিরিয়ে আনার জন্য তার প্রয়াসের বিরাম নেই। কিন্তু ভৈরো কিছুতেই টলে না। যেন ধৈর্য ও ক্ষমার প্রতিমূর্তি। এমন কি পদ্মা রান্না না করলেও আগের মত ক্ষিপ্ত হয় না। বরং বাইরের দোকান থেকে খাবার কিনে এনে নিজে খায়। পদ্মার জন্য রাখে। অবশেষে পদ্মা শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে। "কোমরে কাপড় বাঁধিয়া ভৈরোর নিকট যাইয়া চীৎকার করিয়া বলে—কোন গতরখাকী তোকে মন্তর দিয়েছে যে তুই আমায় এমনি করে পায়ে ঠেলছিস? ভৈরো একটু পাশ ফিরিয়া বলিল, ভৈরো মিস্ত্রী মন্তর টন্তরের ধার ধারে না। পদ্মা ভৈরোর গা ঠেলিয়া বলিল, তুই ভেবেছিস যে কোন মেয়ে মানুষের সঙ্গে পিরিত কচ্ছিস তা আমি জানি না? ......তবে রে মাগী, পিরিত করা দেখিয়ে দিচ্ছি—বলিয়া লাফাইয়া উঠিয়া পদ্মার টুঁটি টিপিয়া ভৈরো তার মুখে দুতিনটা ঘুঁষি বসাইয়া দিল। পদ্মার মাড়ি কাটিয়া দরদর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ভৈরোর গলাটিপুনিতে তার দম বন্ধ হইয়া আসিল।

সে বড় বড় চোখ করিয়া ভৈরোর দিকে চাহিয়া বলিল, তাহলে সত্য সত্য তুই আমায় ভালবাসিস ভৈরো?

ভৈরো দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করিয়া বলিল, তোর মুন্ডু।" গল্পের সমাপ্তি এই। কিন্তু কি নিটোল বাস্তব একটা ছবি আমাদের চোখের সামনে। পদ্মা ও ভৈরোর প্রেম ও সোহাগ বিনিময়ের এর চাইতে ভাল উপায় আর কিছু ভাবা যায় না। এই বাস্তবানুসরণ ও কৃত্রিমতা বর্জনই রমেশচন্দ্র সেনের ছোট গল্পগুলির অনন্যতা।

'ভিখারীর জন্ম' এমন আর একটি আশ্চর্য করুণ গল্প। ভিখারী জীবন ও তাদের দৈনন্দিন জীবিকা নিয়ে আরো কয়েকটি গল্প আমরা পেয়েছি কিন্তু 'ভিখারীর জন্ম' সেগুলি থেকে একটু ভিন্ন ধরণের। এই জীবনের পংকিল ও অভিশপ্ত দিকগুলির পরিচয় আমরা পূর্বের গল্পে পেয়েছি। পেয়েছি আদিম বর্বরতার নিষ্ঠুর পরিচয়। কিন্তু ভিখারিণী প্রসন্নর অসহায় মাতৃত্ব ও প্রেমের নিষ্কলুষ আকাংক্ষা আমাদের মনে এক করুণার্দ্র ভাবের সঞ্চার করে। অথচ অবাস্তব, অবিশ্বাস্য রোমান্টিক আখ্যানও এটা নয়। ভিখারীদের আস্তানা, তাদের কুশ্রী কথাবার্তা, পশুসুলভ আচরণ সব কিছুই অতি নিপুণ অথচ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। তারই মধ্যে প্রসন্ন কিছুটা নরম, অন্য স্বভাবের,

আরো পাঁচটা ভিখারিণীর মতই সেও সন্তানের জননী হয়েছে। সদ্য ভূমিষ্ঠ এই সন্তান সম্বন্ধে তার ধারণা উঁচু কারণ তাদের মত এই শিশুটি পিতৃপরিচয়-হীন নয়। সে অন্ধ, ভুল চিকিৎসায় চোখ দুটো হারিয়েছে আর সেই অন্ধত্বের সুযোগ যে নেয় সেই ছনুয়াকে সে ভালবেসে ফেলে। অপকর্ম করে ছনুয়া জেলে, এমন অসংখ্য ভিখারিণী সে সম্ভোগ করেছে কিন্তু প্রসন্ন তার মুখের কথাকেই বিশ্বাস করেছে এবং মনের কোণে লালন করে চলেছে একটা ভালবাসা। তার জন্ম পথের ধারে। তার মায়ের জন্মবৃত্তান্তও একই রকমের, কিন্তু প্রসন্নর সদ্যোজাত সন্তান তাদেরই ভালবাসার উৎস থেকে এই পৃথিবীতে এসেছে। চারিদিকে কত বঞ্চনা, নিষ্ঠুরতা কিন্তু প্রসন্ন এই পরিবেশে থেকেও অন্য জগতের, অন্য জীবনের। তার এই প্রেম ও মাতৃত্ব হয়ত রুক্ষতা ও ক্লিষ্টতার মধ্যে বেশী দিন স্থায়ী হবে না, কিন্তু সে বিগত দিনের স্মৃতিতে মগ্ন, ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর। গল্পের শুরুতে দেখি, "নূতন গ্রহের জন্মের সময় তারকায় যে বিক্ষোভ যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় ক্ষুদ্র মাতৃদেহকে ততোধিক আলোড়িত ও পীড়িত করিয়া শিশুটি মাঠের ওই ইট ও খোয়ার মধ্যেই ভূমিষ্ট হইল। ভিক্ষুকের ছেলেই হউক আর রাজপুত্রই হউক মানবশিশু মাত্রেরই জীবন-ভূমিকার প্রথম পৃষ্ঠা যে ভাষায় লিখিত হয় এই শিশুটিও সেই ভাষায় শুরু করিয়া দেয় জীবন-যাত্রা। কাঁদিয়া জগৎকে সে তার প্রথম অভিনন্দন জানায়। আর পেটের বোঝা নামিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তার মা ছাড়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস।" বলা হয়েছে সব শিশুই একই ভাষায় শুরু করে তাদের জীবন-যাত্রা। আর দেখানো হয়েছে সব মায়েরই একই চিন্তা, ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখার সংকল্প। মিথ্যাবাদী জোচ্চোর ঠক ছনুয়ার প্রতারণা সে বোঝেনি তাই মনের মধ্যে লালন করেছে, একদিন সে ফিরবে জেল থেকে আর 'ছেলেকে চুমু খাইতে খাইতে প্রসন্ন তাই বলিতেছিল তোকে এসে আদর করবে তোর বাপ।' দুমুঠো অন্নের জোগাড় করার জন্য যাদের সারাদিন ভিক্ষা করতে হয়, ক্ষুধা ও আশ্রয়ের সংস্থানের জন্য সংগ্রাম করে জীবনের শেষ কোমল প্রবৃত্তিটুকুও যাদের নিঃশেষিত, সেখানে এই প্রেম, এই মাতৃত্বের স্ফুরণ খুবই হৃদয়স্পর্শী। সব তিক্ততা, লাঞ্ছনা ও অপমান ভুলে এই সামান্য পুঁজিটুকু নিয়েই প্রসন্ন জগতে টিকে থাকতে চায়। কোন বড় আশা, বড় কল্পনা করার শক্তি তার নেই কারণ জন্ম থেকেই সে ভিখারী কিন্তু সব মায়ের মত তারও আশা, ছেলে এই পরিবেশের বাইরে থাকবে। সব মেয়ের মতই সে

ভাবতে চায় ছনুয়া তাকে ভালবাসত।

ভিখারীদের নিয়ে আর একটি গল্প 'একফালি জমি'। দুইটি ভিখারীর হিংসা দ্বেষ মারামারির গল্প। ভিক্ষার জন্য উপযুক্ত স্থান দখলের লড়াই। জনমেজয় খোঁড়া, কিন্তু যে জায়গায় বসে সে ভিক্ষা করে, "এমন জায়গা আশে-পাশে আর নাই। চারিদিক হইতে চারিটি রাস্তা আসিয়া মিশিয়াছে। কলিকাতা শহর ক্রমে বিস্তৃত হইতেছে এই দিকটায়।

'পাশেই বাজার। একটু দূরে পশ্চিমদিকের রাস্তার শেষ প্রান্তে আদি গঙ্গা। গঙ্গার উপরে হিন্দুর পীঠস্থান কালীমন্দির।' সুতরাং ধর্ম পিয়াষীদের দাক্ষিণ্যে তার ভিক্ষার রোজগার ভালই হচ্ছে। সে ঘরভাড়া দেয় দু'টাকা। পোষ্য তার অনেকগুলি, দুটি বিড়াল, একটি কুকুর, তার পাঁচটি ছানা, এক খাঁচা মনিয়া, আরো নানা রকমের পাখী। অন্য ভিখারীদের এই সৌভাগ্য সহ্য হয় না বিশেষ করে গণেশের। একদিন জনমেজয়ের নির্দিষ্ট জায়গায় বসে পড়ে গণেশ। শুরু হয় মারামারি, গালাগালি, রক্তারক্তি। রাস্তার লোকজন এই দৃশ্য উপভোগ করে, কেউ মন্তব্য করে, 'ভিখারীর জমিদারী নিয়ে লড়াই চলছে রে'। এর পরের ঘটনা হাসপাতাল এবং জেল। দুজনেরই জেল হল পাঁচমাস করে। জেলের মধ্যেও উভয়ের মধ্যে ঝগড়া হয় আবার কখনও মিটে যায়। খালাস পাবার তিনদিন আগে গণেশের কলেরা হল এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মারা গেল। মুক্তি পেয়ে একা ফিরে আসে জনমেজয় আর কেবলই তার মনে হয় গনেশের মৃত্যুর জন্য সেই দায়ী। "সে গঙ্গায় নামিয়া স্নানান্তে তিন অঞ্জলি জল লইয়া সূর্যের দিকে চাহিয়া বলে, 'বাবা সূর্য্যি' গণেশ যদি আবার আসে তাহলে আসে যেন রাজপুত্তুর হয়ে।' অবসন্ন মনে ক্লান্ত দেহে সে ফিরে আসে সেই পুরানো জায়গায়, যার দখল নেবার জন্যই এত রক্তারক্তি, গণেশের মৃত্যু। তার মনে পড়ে গণেশের শেষ কথা। মৃত্যুর পর 'একটি ছোকরা ডাক্তার আসিয়া জনমেজয়কে বলে, কলেরার রোগীটি মরার ঠিক আগে বলে গেছে ছাপ্পান্ন নম্বরকে বোলো সে যেন ঐ জায়গাটায় নিজে বসে আর কাউকে যেন বসতে না দেয়।" ভিখারীর এই অন্তিম উক্তির মধ্য দিয়ে যে অকিঞ্চিৎকর স্বার্থ নিয়ে হানাহানি, যে নিষ্ফল অভিসন্ধি প্রতিনিয়ত আমাদের সকলকে জর্জরিত মোহাচ্ছন্ন করে রাখে তারই এক করুণ মর্মভেদী চিত্র আমাদের সামনে প্রতিফলিত। আর ভিখারী হলেও দুজনের মনে যেন সত্যের অবগুন্ঠন

উন্মোচিত হল। একটা পরম উপলব্ধির তারা সন্ধান পেল।

'ডোমের চিতা' এমন একটি অসাধারণ গল্প, অসাধারণত্ব এর বিষয়বস্তুতে, একেবারে অচেনা অজানা একটা জগৎকে আমাদের সামনে উন্মুক্ত করায়। "ধু ধু প্রকান্ড বিল, চারদিকে শুধু জল আর জল। এই জলরাশির মাঝখানটায় শুষ্ক প্রাণহীণ মাদারের ভিটা যেন প্রকৃতির অনিয়ম। ভিটার উপর পাতাহীন মৃত-প্রায় গাছগুলি বিকলাঙ্গ কুষ্ঠীর মত দাঁড়াইয়া আছে। এখানে ওখানে ছড়ানো রহিয়াছে কয়লা, অর্ধদগ্ধ অস্থি ও মানুষের মাথার খুলি। এই ভিটায় দুটি ডোম থাকে। হারু ও বদন। দুজনেই প্রৌঢ়, স্বাস্থ্যবান ; কালো মিশমিশে তাদের গায়ের রং। হারুর মাথায় ছিল একটা বাবরি। বদনের চুল কদম ফুলের মত চারিদিকে সমান ভাবে ছাঁটা।" এই হারু ও বদনকে নিয়েই এই গল্প। মাদারের ভিটায় যে শ্মশান, সেখানে থাকে তারা দুজন। কোথায় তাদের আদি বাস, কোথা থেকে এই শ্মশানে এসে জমে গেছে কেউ তা জানে না। যেন যমদূতের মত আকাশ হইতে তারা এই শ্মশানের বুকে আবির্ভূত হইয়াছিল মড়ার কাঠ যোগাইবার জন্য। আর 'কাঠ বেচিয়া, মাছ ধরিয়া, মৃতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত চাল ডাল, ফল ফলারি সিদ্ধ করিয়া তারা উদরের সংস্থান করে।' নিখুঁত একটি চিত্র, কয়েকটি বাক্যে হারু ও বদনের জীবন যাপন আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে। মাদারের ভিটা, এই জলরাশি আর মড়া এই তাদের জগৎ। চিতার উপরই হাঁড়ি চড়িয়ে দেয় বা রুটি সেঁকিয়া লয়। তারা কেউ খুব একটা কথা বলে না। হাসি তো ভুলেই গেছে। কোন মৃতদেহ অস্বাভাবিক হলে তাদের হয়ত হাসি পায়, 'কিন্তু সে হাসি হিংস্র জানোয়ারের রুদ্ধ গর্জনের মত বিকট।' এইভাবে দিন চলতে থাকে। হঠাৎ একদিন মধ্যরাতে একজন যুবক মৃত শিশুপুত্রকে নিয়ে এল। এর আগের দুদিন কোন মড়া আসেনি, তাই যুবকের আগমনে খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, আহারের সংস্থান করা যাবে। কিন্তু যুবকটির কাছে মাত্র এক টাকা আছে। অনেক কাকুতি মিনতির পর তারা রাজী হল দাহ করতে কারণ একটা টাকায় আরও কয়েক বেলার চালের সংস্থান হবে। পরদিন সকালে যখন চিতা নিবে আসছে—তখন 'বদন হারুকে একটা টাকা ও কয়েক আনা পয়সা দিয়া বলিল, জলদি গিয়ে চাল নিয়ে আয়। চিতা নিবে যাওয়ার আগে ফিরবি। তা না হলে জ্বালানী কাঠ লাগবে'। 'চিতা নিবে গেল, হারু আর ফিরিল না।' হারু না ফিরলে তাদের খাওয়া হবে না। কয়েকদিন ধরেই ভালভাবে খাওয়া

হচ্ছে না। তাই হারুর প্রতীক্ষায় এদিক ওদিক চেয়ে দেখে, কিন্তু হারুর কোন পাত্তা নেই। তারপর একদল ভদ্রলোক আসে একটি স্ত্রীলোকের শব নিয়ে। তাদের নৌকোখানা নিয়ে কাঠ আনতে যায় বদন এবং ঘন্টাখানেক পরে হারুর মৃতদেহ নিয়ে ফিরে আসে। স্ত্রীলোকটির শব দাহ হয়ে গেলে, 'বদন ভাল করিয়া একটি চিতা সাজাইল। তারপর যত্নের সহিত হারুর শবটি চিতার উপর তুলিয়া দিল'। চিতার দিকে চেয়ে বদন মনে মনে ভাবল, দূর ছাই, কিছুই আর ভাল-লাগে না। চিতার আগুন আর সূর্যের আলো মিলে মাদারের ভিটা লাল আভা ধারণ করল। 'চিতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বদনের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।' ভাষার কারুকার্য নেই, বর্ণনার আতিশয্য নেই অথচ কি একটা যাদু আছে লেখায় যা আমাদের নিয়ে যায় মাদারের ভিটায় যেখানে সৃষ্টিছাড়া এই দুই প্রাণীকে আমরা প্রত্যক্ষ করি স্পষ্টভাবে। ডোম জাতির সামগ্রিক কোন পরিচয় নেই কিন্তু মড়া পোড়াতে পোড়াতে তারা যতই মানুষী সত্তা হারিয়ে ফেলুক না কেন, একটু হয়ত অবশিষ্ট থাকে, তাই যেন বদনের চোখের জলে ফুটে ওঠে। কি নিবিড়ভাবে লেখক দেখেছেন সমাজের এই শ্রেণীর সব লোকদের, তার প্রমাণ রয়েছে প্রতি ছত্রে।

'ভাত' গল্পে এই কারুণ্যের ছবি আরো মর্মান্তিক, হৃদয় ভেদী। সুন্দরবন থেকে মাধব ও তার স্ত্রী মালতী এসে বাসা নিয়েছে পিচ-ঢালা চওড়া সড়কের ফুটপাতে। তারা ভিক্ষজীবী ছিল না কিন্তু আজ ভিক্ষাই তাদের অন্ন সংস্থানের উপায়। 'দেশে বসে তারা শুনেছে কলকাতায় টাকা অঢেল, দাতাও বহু। বড় লোকেরা পিঁপড়াকে চিনি খাওয়ায়। রাস্তার ষাঁড়কে দেয় লুচি, জিলিপি।' কিন্তু তাদের ভাগ্যে ভিক্ষা জোটাও দুষ্কর। স্বজাতি বলে ধনীর সহানুভূতি থেকে মানুষ জাতটা বাদ পড়ে গেছে যেন।' এই ভাবেই যেদিন যা জোটে অর্দ্ধাহারে অনাহারে দিন যায়। অথচ আগের জীবনে তাদের 'কুঁড়ে হলেও নিজের জমিতে নিজের ঘর, চাষের জমি, হাল বলদ ছিল। পর পর ক'বছর বন্যা হল। নোনা জলে জমি চাষের অযোগ্য হয়ে গেল। পুকুরে মাছ রইল না।' তাই ফুটপাতে বাসা, ভিক্ষাই সম্বল। পরণের কাপড় শত-ছিদ্র। বৃষ্টি হলে দুরবস্থার সীমা থাকে না। গল্পের শেষটা যেমনি করুণ, তেমনি নিষ্ঠুর। "মালতীর ভাতের হাঁড়ি চড়ল বেলা দুটোর পর।...ছেলেরা চেয়ে আছে হাঁড়ির দিকে। মাধব এখনও করছে ভিক্ষার চেষ্টা। চেয়ে চিন্তে

যদি দু'টুকরো আনাজের ব্যবস্থা করতে পারে। ফুটন্ত ভাতের গন্ধ বেরুতে লাগল। পৃথিবীতে এত খোশবায় নিশ্চয়ই আর নেই, না গোলাপের, না বেল, যুঁই, টগরের, না কাঠালি চাপার।" এই গন্ধে মালতীর ও তার ছেলে-মেয়েদের শীর্ণ শরীরেও নূতন উৎসাহের সঞ্চার হচ্ছিল। মালতী ভাবছিল, 'কি ক্ষ্যামতা ভাতের। কী সুগন্ধ।' কিন্তু তাদের ভাত খাওয়া আর হয় না। ছোট মেয়েটি আগুনের দিকে যাচ্ছিল। মালতী তাকে ধাক্কা দিয়ে সরাতে গেলে সে পড়ল একটা থান ইটের উপর আর ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুল। মাধব রক্ত দেখে একটা বাঁশ দিয়ে মালতীর পিঠে মারল এক ঘা আর দ্বিতীয় ঘা গিয়ে পড়ল মাটির হাঁড়ির উপর। হাঁড়ি ভেঙে ফেনসহ ফুটন্ত ভাত সব আগুনে পড়ে গেল। আর ছেলে দুটো ভাত গেল, ভাত গেল, বলে কেঁদে উঠল। 'বাতাসে তখনো ভাতের গন্ধ ভাসছে। মালতীর নাকে আসছে সেই গন্ধ। আর মাধব ছুটে পালিয়ে গেল। এ গন্ধ তার আর সহ্য হয় না।' গল্পের শেষ, আর আমাদের মনে এক রিক্ততা, ভাষাহারা বেদনা। রমেশচন্দ্রের গল্পকে সারাংশ করে বলা যায় না, কারণ তাঁর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন বাক্যই যেন ব্যবহৃত হয়নি। অবশ্য সেখানে দৈব, নিয়তি ও ভাগ্যের এই নির্মমতা, এই প্রতিকূলতা তিনি তুলে ধরেছেন। এরা এইভাবেই বেঁচে থাকে। কেন ও কিসের জন্য, কার শোষণে ও নিপীড়নে এই সব তথাকথিত নিঁচুতলার অধিবাসীরা এইরকম পশুর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে সে সম্বন্ধে তিনি আশ্চর্য রকম ভাবেই নীরব। তাই গল্পকারের অধিকার সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা সেটা তিনি কখনো লঙ্ঘন করতে চান নি।

'তারা তিনজন,' 'কৈলাস' এবং 'সাদা ঘোড়া' প্রভৃতি গল্প অবশ্য কিছুটা আলোচিত এবং যথেষ্ট পরিমাণে সমাদৃত। নদীর মোহানায় হারিয়ে যাওয়া তিন জন মাঝি—কানাই বিষ্টু ও যাদব জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণপাত লড়াই করে চলেছে। উপরে অনন্ত আকাশ নীচে অপার জলরাশি। নদীর এপারে বরিশাল জিলা, ওপারে নোয়াখালি। এই পটভূমিতেই ওদের শুরু হয়েছিল নৌকাভিযান। কিন্তু দিকভ্রান্ত হয়ে কোথায় যে হারিয়ে গেল তা তারা নিজেরাও জানে না। নৌকার মধ্যেই মারামারি, গালাগালি, ঘরের চিন্তা, ফেরার আগ্রহ ও অনিশ্চয়তা সব মিলিয়ে আমাদের হৃদস্পন্দন থেমে যাবার জোগাড়। কানাই আগেই মারা গেল। বিষ্টুও অনেক সংগ্রামের পর মারা

যায় আর যাদব ফিরে এল অচেতন অবস্থায়। এক সাহেব ডাক্তার কোনক্রমে তাকে বাঁচিয়ে তোলে। অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যাদব প্রাণ ফিরে পেল। কারণ 'বিজ্ঞান জয় করিল মৃত্যুকে'। জ্ঞান ফিরে পেয়ে 'যাদব আপন মনে বলিতে লাগিল, তিনজনে আমরা আইছিলাম। তিনটি মানুষ—যাদব, কানাই আর বিল্টু।' এ গল্পটিতে একটা বিশাল ভয়াবহতা রয়েছে যা সচরাচর আমাদের গল্প-সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায় না। কি অসামান্য বাস্তবতায় কানাই, বিল্টু ও যাদবের দৈনন্দিন জীবন, তাদের রাগ অনুরাগ, হিংসা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা আবার পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও মমত্ববোধ ফুটিয়ে তুলেছেন ভারত বিস্ময় লাগে। অসীম অনন্ত জলরাশি বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই। এদের মাঝি-জীবনের সব অভিজ্ঞতা ও কৌশল যখন ব্যর্থ, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে তারা আবার ফিরে পেতে চায় পুরনো জীবন এবং সেই আশাও যখন অন্তর্হিত তখন এই দুর্যোগের সাথীদেরই নতুন করে ভালবাসে। মনের ভাবকে প্রকাশ করার শিক্ষা তারা পায় নি। শুধু অর্থময় বোবা চাহনিতে জানায় মনের বেদনা ভালবাসা। জলরাশির উদ্দাম উন্মত্ত স্রোতপ্রবাহে যখন এদের বাঁচার সংশয় অতি ঘনীভূত, তখন যে ভাষা তা অতি সাদামাঠা কিন্তু প্রতিটি শব্দই যেন আসন্ন বিপদের সংকেত বহন করে আনে। বাংলা ছোটগল্পের কলেবরে তারা তিনজন একটি উজ্জ্বল সংযোজন।

উজ্জ্বল সংযোজন 'সাদা ঘোড়া' ও 'কৈলাস' ও বটে। তবে এই গল্পদুটি অপূর্ব রসোত্তীর্ণ হলেও একেবারে নতুন ধরণের বা আমাদের অনাস্বাদিত নয়। প্রভাত মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, তারাশংকর প্রমুখ সাহিত্যিকরা অবলা নিরীহ প্রাণীদের মধ্যে মানুষোচিত কোমল করুণ প্রবৃত্তির আরোপ করে সার্থক রস সৃষ্টি করেছেন। হাতিই হোক্ বা বলদই হোক্, রক্ষাকর্তার সুখে দুঃখে এই জন্তুদের মনেও যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তার নিদর্শন তো প্রচুরই পাওয়া যাবে বাংলা সাহিত্যে। তবে সাদা ঘোড়ার বিশিষ্টতা এর পটভূমি। হিন্দু মুসলমানের আত্মঘাতী রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে এই গল্প। পালক সহিসের সঙ্গে একাত্মতা, দুদিনের আশংকায় ঘোড়াটির শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া এবং পরিশেষে মিলিটারির গুলিতে মারা যাওয়া সব কিছুই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে গেছে। সাদা রং যেন শান্তির প্রতীক। কোথা থেকে ঘোড়াটি বেপাড়ায় এসেছে কেউ তা জানে না। তবে তাকে বাঁচানো, লালন পালনের মধ্য দিয়ে সকলের চেতনা

যেন নতুন করে জেগে উঠেছে। এই হানাহানি অনর্থক রক্তপাতের বিরুদ্ধে। আর ঘোড়াটির মৃত্যুতে যেন অতি নির্দিষ্ট শোচনীয় ভাবে সকলের চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে দিল। অন্যান্য এই জাতীয় গল্পগুলির সংগে পংক্তিভুক্ত হবার দাবী রাখে 'সাদা ঘোড়া।'

কৈলাসও বিষয়বস্তুতে তেমন অভিনব নয়। হাবাগোবা কৈলাস সকলেরই মন জুগিয়ে চলে। অতি অল্পে সন্তুষ্ট, কারো ব্যঙ্গ বিদ্রূপে সে কর্ণপাত করে না। যারা তার পিছনে লাগে এক অবজ্ঞার হাসি তাদের নস্যাৎ করে দেয়। এই হাবাগোবা কৈলাসের মনেও যে সংসাব পাতার একটা আগ্রহ, প্রেমের প্রকাশ তা যেন ওব স্বভাব ও চলাফেরার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ভাষা যার আয়ত্তে নেই, নিজের চাহিদা সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সেই লোকের মধ্যেও যেভাবে একটা অস্পষ্ট, ধোঁয়া ধোঁয়া কোমল অনুভব, অনুভূতির সঞ্চার হয়েছে তা স্বাভাবিক ভাবেই চিত্রিত হয়েছে। আমাদের সহানুভূতি হয়ত জাগে কিন্তু ঘটনার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে কোন অকারণ উদ্বেগ বোধ করি না।

রমেশচন্দ্র যেখানে তাঁর এই নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন সেখানেই তাঁর মৌলিকত্ব পরিস্ফুট, নইলে কল্পনায় ভর করে, শুধু চিন্তাকে আশ্রয় করে যে সব গল্প বা উপন্যাস তিনি লিখেছেন তা হয় অতি সাধারণ বা অতি জোলো। তবে সুখের বিষয় তিনি খুব বেশী লেখেন নি, তাই অবাঞ্ছিত পরগাছার সৃষ্টিও বেশী হয় নি।

একথা বলা যায় নিঃসন্দেহে যে রমেশচন্দ্র সেন তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা ও সাহিত্যিক স্বীকৃতি আরো বেশী পাবেন ভবিষ্যতে, কারণ সে সম্ভাবনা তাঁর লেখার মধ্যে রয়েছে। হয়ত একটু বেশী পরিমাণে অগতানুগতিক বা ভিন্ন পথের পথিক বলে সমসাময়িক উচ্ছ্বাস বা আবেগের দ্বারা তিনি সম্মানিত হন নি কিন্তু প্রকৃত বিদগ্ধ ও রসগ্রাহী সমালোচকদের দ্বারা তিনি অভিনন্দিত হয়েছেন। সুতরাং বিস্মৃতির এই সাময়িকতা থেকে তিনি ও তাঁর রচনা মুক্ত হয়ে উপযুক্ত ভাবেই মূল্যায়িত হবেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

গোকুল চন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫)

'তুমি নব বসন্তের সুরভিত দক্ষিণ বাতাস
ক্ষণ তরে বিকম্পিত করি গেলে বাণীর কানন—'

গোকুল নাগের অপরিণত মৃত্যুতে সদ্য-কৈশোর উত্তীর্ণ বুদ্ধদেব বসুর শোক প্রশস্তি। যে 'কল্লোল' পত্রিকা এক উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করে কালজীর্ণ সব কিছুকে নস্যাৎ করার স্পর্ধা নিয়ে তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে আবির্ভূত হয়েছিল, অন্তত এর সঙ্গে জড়িত সকলেই সেই দাবি করে থাকেন, তার অন্যতম প্রাণপুরুষকে দক্ষিণ বাতাসের সঙ্গে উপমেয় হওয়াটা অনেকেরই অস্বস্তির কারণ হতে পারে। কিন্তু নিতান্ত অলক্ষ্যে কতকটা সাক্ষাৎ পরিচিতির অভাবে বুদ্ধদেব বসু যে উপমিতির প্রয়োগ করেছেন তা যথার্থ এবং সঠিক। কারণ অঙ্কুর থেকে যে বিরাট বনস্পতির সৃষ্টি হয়, তার আকৃতি আয়তন দেখে উপলব্ধি করা কঠিন অঙ্কুরের রীতি ও প্রকৃতি। বস্তুতঃ কল্লোল-পন্থীদের ধ্যান ধারণার সহমর্মী, এমনকি মূল উৎস হয়েও গোকুলচন্দ্র ছিলেন স্বভাব কোমল, স্বল্পবাক, শান্ত, স্থিতধী ও অন্তর্মুখ। দারিদ্র্য এবং দুঃখ নিত্যসঙ্গী ছিল, তাই অন্যের কষ্ট যন্ত্রণা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করতেন। সাধ্যমত বাড়িয়ে দিতেন সহযোগিতার হাত, অতি গোপনে সবার অন্তরালে।

নিজের কীর্তির চেয়ে মহৎ অনেকেই নয়। তাদের জীবনের রথও কীর্তিকে পশ্চাতে ফেলে যায় না। জনসমাদৃত, জনসমক্ষে মহৎ রূপে কীর্তিত বহু বরণীয় লোকের ব্যক্তিগত জীবন মসীলিপ্ত। তাদের যে সমুজ্জ্বল ব্যক্তিরূপ বহির্বিশ্বে উদ্ভাসিত একান্ত পারিবারিক বা ব্যষ্টি জীবনে তা হয়ত অনেক স্থলেই সংকীর্ণ ও স্বার্থপরতাদুষ্ট। কিন্তু গোকুলচন্দ্রের স্বল্পায়ু জীবন ও ততোধিক স্বল্প কর্মজীবন বোধ হয় আক্ষরিক অর্থেই স্বীয় কীর্তির চাইতে মহৎ। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যসামগ্রী ধারে এবং ভারে নিতান্ত অপাংক্তেয় নয়। বৈশিষ্ট্য ও অনন্যতায় সে-সব রচনা তৎকালীন অনেক সাহিত্য রসিকের সপ্রশংস

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু সে সব ছাপিয়ে দীপ্যমান তাঁর জীবন ও সাধনা। সবার অলক্ষ্যে একান্ত নিভৃতে আন্তর প্রেরণায় যে কয়টি গল্প কবিতা বা উপন্যাস লিখেছেন, তুলি ও রঙে যে কটি ছবি উপহার দিয়েছেন তার মধ্যে আর যাই হোক্ গোকুল নাগ পূর্ণ বিকশিত নন।

মাত্র একত্রিশ বছর আয়ুষ্কাল! সাহিত্য প্রতিভা ও আদর্শের সম্যক বিকাশ ও পরিণতির যথেষ্ট সময় পান নি। জীবিকান্বেষণের জন্য এর মধ্য থেকেও ব্যয়িত হয়েছিল অনেকটা সময়। অবশ্য এই আয়ু-পরিধির মধ্যেই শেলী, কীটস্ তাঁদের কালজয়ী সৃষ্টি রেখে গেছেন। কিন্তু সকলেই তো বাণীর বরপুত্র অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী নয়। জীবনের প্রত্যয়বোধে সাহিত্যাদর্শের সুসম্পৃক্তির জন্য, রচনাকে পূর্ণ বিকশিত করার জন্য কিছু অনুশীলন, কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন। তাই সম্যক বিকাশেব জন্য অধিকাংশ সাহিত্যসেবীর পক্ষে তিরিশ একত্রিশ বছর খুবই কম। তবু আমাদের সাহিত্যে ও সাহিত্যানুরাগীদের কাছে যার জন্য গোকুল নাগ চিরস্মরণীয় তা হল তাঁর প্রাণের উত্তাপ, যে উত্তাপে অনেক নতুন লেখক শিল্পী নিজেদের উদ্দীপিত করেছেন। নতুন নতুন সৃষ্টির সাধনায় পেয়েছেন উষ্ণ সহাযতা। তাঁরই প্রচেষ্টায়, প্রেরণায় বহু তরুণ এগিয়ে এসেছিলেন, যাঁরা পরবর্তীকালে সাহিত্যের অঙ্গনে সংযোজন করেছেন বহু অদেখা অচেনা প্রেক্ষাপট। সমসাময়িক সকলেরই, তরুণ, ও বয়স্ক সবারই স্মৃতিচারণায় গোকুলচন্দ্রের চরিত্রের এই বিশেষ গুণগুলিই বারবাব উল্লিখিত হয়েছে পরম শ্রদ্ধা ও মমতায়।

পাদপ্রদীপের আলোয অনেকের বিহারই স্বচ্ছন্দ নয়। একান্ত নিভৃত গোপন কক্ষ থেকে অনেকে আলো বিকিরিত করেন, যার প্রোজ্জ্বল দীপ্যমানতা উপলব্ধ হয়, কিন্তু উৎস রয়ে যায় অনালোকিত, অনাবিষ্কৃত। গোকুলচন্দ্র নাগ এর সার্থক উদাহরণ। যাঁদের মধ্যেই প্রতিভার সামান্য সংকেত পেয়েছেন, তারই উন্মেষ সাধনের জন্য ছিল নিরন্তর প্রয়াস, অক্লান্ত সেবা-পরিচর্যা। 'কল্লোল যুগে' গোকুলচন্দ্রের এ সব গুণের অতি সুন্দর ও বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অপরূপ ভঙ্গীতে, হৃদয়গ্রাহী ভাষায়।

অগ্রজপ্রতিম দিনেশরঞ্জন তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, 'ফুল নিযে এর বেসাতি, দুনিয়ার জানোয়ার নিয়ে এর বসবাস, হৃদয় তাই ফুলের মতন কোমল, মনটি তেমন সুন্দর, আর শীর্ণ দেহেও পশুজগতের প্রাণ-প্রাচুর্য। অথচ মনের মধ্যে

মানব মনের অনন্ত জিজ্ঞাসা। তাছাড়া ইনি চিত্রশিল্পী। আর যে অশান্তির ঝড় মানুষকে আদিম অবস্থা থেকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে দর্শন কাব্য বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে, সেই অশান্তিই ওর মনকে দোলা দিচ্ছে। ও বলে, যে তরুণের মনে ঝড়ের দোলা নেই, সে তো বুড়িয়ে গেছে, স্থবির ও স্থাবর। ওর অন্তরঙ্গ প্রভঞ্জন মূর্ত হয় ওর মুখে, বাঁশের বাঁশিতে, হাতের তুলি ও রঙে।" সাহিত্য চিত্র, সঙ্গীত, অভিনয়, ললিতকলার সকল প্রাঙ্গণেই ছিল তাঁর অবাধ ও সাবলীল বিহার যার জন্য অচিন্ত্যকুমার তাঁকে অভিহিত করেছেন 'মূর্তিমান ফোর আর্টস' বলে।

গোকুল নাগ যুক্ত ছিলেন ফোর আর্টস ক্লাবের সঙ্গে। তিনি ও দীনেশরঞ্জন দাশই ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা, যেখানে জাতিধর্ম, স্ত্রীপুরুষ, বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেরই ছিল অবাধ প্রবেশাধিকার, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার জন্য, অবরুদ্ধ চিন্তা ভাবনাকে মুক্ত করার জন্য। এই ফোর আর্টস ক্লাব থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশেব পরিকল্পনা হয়েছিল যা আর বাস্তব হয়ে ওঠে নি। দেড় দুই বছর চলার পর এই ক্লাব উঠে যায় এবং সেই সময় দিনেশরঞ্জন কল্লোল প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন গোকুলচন্দ্রকে সহযোগী করে। বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন সুরের ধ্বনি শোনা গেল। সূচিত হল একটি নতুন যুগ: দিনেশরঞ্জন দাশ পরিকল্পক আর রূপায়ক হলেন গোকুল চন্দ্র। এঁদের যুগ্ম ব্যাকুলতায়, অতন্দ্র সাধনায় ১৯৩০ সালে কল্লোলের আত্মপ্রকাশ। নবজাত এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই এর উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী বিধৃত হয়েছিল দিনেশরঞ্জনের কবিতায়—

আমি কল্লোল শুধু কলরোল দিশাহীন
অজানা জানার নয়নের বারি
নীল চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি
পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি ফিরে আসি নিশিদিন।
....
আশা আছে তবু যদি কোনদিন শত শত যুগ পরে
বধির শিলায় ফেটে যায় বুক
গুঁড়াইয়া যায় তার নিজ সুখ
জল-কল্লোল তুলি ভীম রোল বক্ষ তাহার ভরে।

যে নিরন্তর দুঃখ-কষ্ট মানুষকে ভোগ করতে হয় আজীবন আমরণ, তার

নিরসনের জন্য যৌবনের অভিষেক প্রয়োজন। যৌবনের আহ্বান তাই কল্লোলের সূচনায়। আর এই যৌবন চাঞ্চল্যকেই সজীব সপ্রাণ করে তুলতে নিজের প্রাণ নিবেদন করেছিলেন গোকুলচন্দ্র নাগ।

সাধারণ নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলে। অল্প বয়সেই পিতা মাতাকে হারিয়ে মামার বাড়িতেই মানুষ হন সকল ভাইবোন সহ। অগ্রজ ডঃ কালিদাস নাগ তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। সাউথ সাবার্বাণ স্কুলের পাঠ্যাবস্থাতেই বাবা মা মারা গিয়েছিলেন। বেশিদূর পর্যন্ত পড়াশুনা করতে পারেন নি রুগ্ন স্বাস্থের জন্য। থার্ড ক্লাশে প্রমোশন না পেয়ে মেদিনীপুরে কিছুকাল পড়েছিলেন কিন্তু সেখানেও বেশিদূর এগোতে পারেন নি, ফলে স্কুল কলেজের শিক্ষার এখানেই সমাধি ঘটল। ছবি আঁকার দিকে একটা ঝোঁক বরাবরই ছিল, তাই ভর্তি হলেন সরকারী আর্ট স্কুলে। মামারা বিশেষ করে বিজয় বসু এই আর্ট স্কুলের ব্যাপারটা বিশেষ ভাল চোখে দেখতেন না। যা হোক, এখান থেকেই তিনি ফাইনাল পরীক্ষা পাশ করেন। এবং ছবি এঁকে সামান্য কিছু উপার্জনও করতে থাকেন। এখানেই তিনি অতুল বসু, যামিনী রায় প্রমুখ শিল্পীদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এবং চিত্রবিদ্যায় তাঁর যেটুকু দক্ষতা তা এঁদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। ছবি আঁকা ছাড়াও গান গাইতে, বেহালা বাজাতে পারতেন গোকুলচন্দ্র।

আর্ট স্কুলের শিক্ষার পর প্রত্নতত্ব বিভাগে চাকুরী নিয়েছিলেন এবং কাজের উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় যাতায়াত করতে হয়েছিল, কিন্তু শরীর ভাল না থাকায় ফিরে আসতে হয় কলকাতায়।

নিউ মার্কেটে মামাদের একটি ফুলের দোকান ছিল। বিজয় বসুর ভাই সুরেন বসু সেই দোকান চালাতেন। সেখানেই গোকুল নাগের পরবর্তী কর্ম-সংস্থান হল। এই দোকানে অনেকেরই যাতায়াত ছিল। অনেক তরুণ লেখক শিল্পীদের। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে জানা যায় ফুলের দোকানে গোকুলের হাতে বিক্রীর চাইতে উপহারই হত বেশি। এই ফুলের দোকানেই পরিচয় হয় দিনেশরঞ্জন দাসের সঙ্গে। সে পরিচয় এক নিবিড় সখ্য ও সহমর্মিতার মধ্য দিয়ে সূচনা করেছিল ফোর আর্টস ক্লাবের। সৃষ্টি করেছিল 'কল্লোলের'।

মামা বিজয় বসু ছিলেন চিড়িয়াখানার অধিকর্তা। এই চিড়িয়াখানার চত্বরেই

প্রথমে গড়ে উঠেছিল ফোর আর্টস ক্লাব, সূচনা হয়েছিল বলা চলে। এই সময়েই কিছুকালের জন্য চিত্রাভিনয় ও নাট্যাভিনয়ে অংশ নিতে দেখা যায় তাঁকে। 'বাঁদীর প্রাণ' নামে নির্বাক চিত্রে একটি গৌণ ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এবং অপেশাদার নাটকাভিনয়েও মাঝে মাঝে অংশ নিতেন। কখনো অভিনেতা রূপে, কখনো মঞ্চসজ্জা নির্মাণের ক্ষেত্রে। চলচ্চিত্র বা মঞ্চাভিনয় নেহাৎই সাময়িক, গোকুলচন্দ্রের আন্তর প্রেরণায় নয়। তবে সংগীত তাঁর হৃদয়েরই অভিন্ন সত্তা। গান গাইতেন, বেহালা বাজাতেন এবং এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা না থাকলেও সহজাত নৈপুণ্য ছিল।

গোকুল নাগ যেটুকু বিকশিত তা কল্লোলকে কেন্দ্র করেই। এই পত্রিকার সম্পাদনা পরিচালনার প্রায় সবটুকু দায়িত্বই ছিল তাঁর। ফুলের দোকান দেখাশোনা, জীবিকার জন্য চিত্রাংকণ করা সব কিছু সত্ত্বেও কাল্লোলের নিয়মিত প্রকাশনার জন্য পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার অভাব ছিল না একটুও। এতসব কর্মব্যস্ততার মধ্যেও অব্যাহত ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনা। গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও অনুবাদ যা রচনা করেছেন তা খুব বেশি না হলেও সেসব তাঁর সাহিত্য প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর তো বটেই, তাঁর অসাধারণ সৃষ্টিশীল উদ্যমী ব্যক্তিত্বেরও পরিচায়ক।

কল্লোলে পূর্ণ নিমজ্জিত হবার আগে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, নবভারত প্রভৃতিতে ছাপা হয়েছিল কয়েকটি গল্প কথিকা, এই সবের নয়টি নিয়ে সংকলিত 'রূপরেখা'। ফোর আর্টসের যুগে বেরিয়েছিল 'ঝড়ের দোলা,' চারজনের লেখা চারটি গল্প, গোকুল নাগের 'মাধুরী' নামের গল্পটি এর অন্যতম। অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'রাজকন্যা,' ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা। 'পরীস্থান,' মেটারলিংকের একটি নাটকের কাহিনী অবলম্বনে ছোটদের জন্য রচিত উপন্যাস। গল্প সংগ্রহ 'মায়ামুকুল' এবং উপন্যাস 'পথিক'—যে দুটিতে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যে তিনি কি বার্তা নিয়ে এসেছেন ভাবীকালের জন্য, কি তাঁর চিন্তা ভাবনা সে সবই কিছুটা অস্ফুট অথচ দ্বিধাহীন ভাবে বর্ণিত হয়েছে 'মায়ামুকুল' আর 'পথিকে'।

কল্লোল আবির্ভূত হবার পর থেকেই শুরু হয় তাঁর নিরবচ্ছিন্ন কর্মসাধনা, কল্লোলকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ক্লান্তিহীন প্রয়াস। কখনো উদগ্র আগ্রহে লেখা সংগ্রহের প্রচেষ্টা, বিজ্ঞাপন ও প্রচার বৃদ্ধির জন্য অক্লান্ত উদ্যম আবার অর্থা-

ভাবক্লিষ্ট বন্ধুদের সাহায্যের জন্য নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষিত করা, গোকুল নাগের এই ভূমিকাটিই যেন সবচেয়ে উজ্জ্বল। এর ছেদ ঘটেনি কখনো, পড়েনি কোন বিরাম চিহ্ন, যতদিন না দেহের ভিতর পুষে রাখা রাজরোগ তাঁকে অপসারিত করল পৃথিবী থেকে।

গোকুলচন্দ্র থাকতেন মামাদের বাড়ীতে, অতি সন্ত্রস্ত সলজ্জভাবে, কারণ মামাবাড়ীর পরিবেশ ছিল কিছুটা উন্নাসিকতা ও কৃত্রিমতায় ভরা। তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত, তাই আচার-আচরণ, চলা-ফেরায় একটা মার্জিত পরিশীলিত ভাব বজায় রাখাটাই ছিল সেখানে অনুমোদিত রীতি। বাউন্ডুলে, অকৃতী, পরার্থপর গোকুলের কোন সগৌরব স্থান ছিল না সেখানে, যদিও কখনো প্রকাশ্যে কোন প্রতিকূলতা তাঁকে সহ্য করতে হয়নি। তবু গোকুল নাগ এটা মনে মনে অনুভব করতেন, সংকোচ বোধ করতেন। অতি দীনহীনভাবে তাঁকে থাকতে হত নিছক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য, নিজেকে এবং কল্লোলকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। গোকুল ছিলেন পত্রিকার সহ সম্পাদক, কার্যত সব ভারই বহন করতে হত তাঁকে। কারণ এই কল্লোলই ছিল তাঁর প্রাণের অভিব্যক্তি, আত্মার উল্লাস। কিন্তু তাকে বাস্তব করে তোলার সম্পদ বা সামর্থ্য দুটোরই ছিল অপ্রতুলতা। তাই সকল বন্ধুদের, কল্লোলের সঙ্গে যুক্ত সকলকে ডেকে বলতেন, 'আমাদের স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত হোক তোমাদের কর্মকুশলতা, যে বন্ধ পল্বলে মানবাত্মা অবদমিত, অপচয়িত, মুক্ত কল্লোলে তা সঞ্জীবিত হোক।' মূলতঃ কল্লোল আর গোকুল নাগ অনেকটা অভিন্নসত্তা, একের থেকে অন্যের পৃথকীকরণ কোনমতেই সম্ভব নয়। তাই গোকুলের সাহিত্যভাবনা, কর্মদ্যোতনা পর্যালোচনা করতে গেলে কল্লোলের উদ্ভব ও বিকাশের পিছনে কি আদর্শ, কি অনুপ্রাণনা ছিল তার কথা অনিবার্যভাবেই এসে যাবে। কারণ একের ইতিহাস, অন্যের জীবনবেদ।

এই পত্রিকা প্রকাশের প্রাক্‌লগ্নে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত। বিশ্বজুড়ে সর্বব্যাপী অস্থিরতা, প্রাচীন মূল্যবোধের ক্রমাবলুপ্তি। আর বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্যে নব নব চিন্তা ও মতাদর্শের আমদানি। একদিকে কিছু সংখ্যক লোকের হঠাৎ বিপুল অর্থপ্রাপ্তি, অপর প্রান্তে শত সহস্র কর্মহীন শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের উদ্ভব। অর্থনীতিক ভারসাম্যের এই দোলাচলতায় পুরানো সমাজ ব্যবস্থা সব দেশেই বিপর্যস্ত। সকলেই যেন পথনিরুদ্ধ, কর্তব্যবিমূঢ়। ভবিষ্যতের

কোন সুস্পষ্ট সুরেখায়িত জীবনভাষ্য তাদের মননে অনুপস্থিত। 'The city in some way perished, pserished from being the heart of the world, and became a vortex of broken passions, lusts, hopes, fears and horrors'. এই বাণী শুধু লন্ডন নয়, কলকাতা তথা বিশ্বের সকল সংস্কৃতির পীঠস্থান সম্পর্কেই প্রযোজ্য। আর সংস্কৃতির মূলে যখন কূলপ্লাবী ঢেউ লাগে তখন সব থেকে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে যুব সম্প্রদায়। কলকাতা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপাশ্রয়ী নগর। এখানের যুবমানসে যে চঞ্চলিত প্রাণপ্রবাহ, তাকে মূর্ত করে তুলতে চেয়েছে 'কল্লোল'। তাই এই পত্রিকা সেই যুগযন্ত্রণা, যৌবনতরঙ্গের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, সেদিনের যুব ভাবনার অনুষঙ্গী।

অনেকে মনে করেন কল্লোল গোষ্ঠী এক কালাপাহাড়ী ভূমিকা নিয়েই অবতীর্ণ হয়েছিল। যা কিছু শ্রদ্ধেয়, বহু যুগবাহিত, তাকেই অস্বীকার ও পর্যুদস্ত করাই যেন এঁদের স্বভাব ধর্ম হয়ে উঠেছিল। কথাটা আংশিক সত্য, কারণ এঁদের সৃজনশীলতা, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার জেহাদ ঘোষণাকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যের পরিধি কি গল্প উপন্যাসে, কি কবিতা প্রবন্ধে, কল্লোলীরা অনেকটাই বিস্তৃত ও বহুধা করেছিলেন। সাহিত্যের প্রাঙ্গণে এল মুটে মজুর চোর ডাকাত, গরীব ভিখারীর দল। কয়লা কুঠির শ্রমিক থেকে অতি স্বল্পবিত্ত কেরাণী কুলেরও আসন জুটল মনুষ্যত্বের ভাগীদার হিসাবে। দেখা দিল নিষিদ্ধ পল্লীর অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনযাত্রা, অসামাজিক প্রেম সম্পর্ক, যৌনতার অলজ্জ প্রকাশ। জোলা, হ্যামসুনের সাহিত্যে যেমন এঁরা উদ্বোধিত হলেন, তেমনি ফ্রয়েড, এলিসের চিন্তাধারাও প্রোথিত হল এই সব দুঃসাহসী সাহিত্যসেবীদের মধ্যে। এই সকল চিন্তাধারার অবিরাম প্রকাশ পেল অচিন্ত্য-প্রেমেন-বুদ্ধদেবের উচ্ছাসময় প্রারম্ভিক পর্যায়ের গল্প-উপন্যাসে, কবিতা ও প্রবন্ধসমূহে।

শুধু বিষয়বস্তু বা ভাবরাজ্যই নয়, প্রকাশভঙ্গীর বে-আব্রুতা, শব্দ চয়নের উৎকট বাসনা, আঙ্গিকের সচমক অভিনবত্বের মধ্য দিয়ে তাঁরা যুগের চাহিদা মেটাতে চাইলেন। আর রবীন্দ্রনাথকে অগ্রাহ্য করে তাঁর সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার মধ্যেই যেন অনেকে চরিতার্থতা খুঁজে পেলেন। এই প্রবণতা, এই উন্মাদনার আকর রূপে দেখা দিল কল্লোল, যার মধ্যমণি, চলার সারথি হয়ে বিরাজিত ছিলেন গোকুল নাগ। সবার জন্যই অবারিত দ্বার, সস্মিত সাদর

আপ্যায়ন, মুহূর্তেই পরকে আপন করে নেবার অসামান্য ক্ষমতা আর আশাভরা ভবিষ্যতের স্বপ্নময়তা।

যে দর্পিত, স্পর্ধিত প্রকাশভঙ্গি উচ্চকিত ছিল অন্য সব কল্লোলপন্থী সাহিত্যিকের মধ্যে, গোকুলের নিজস্ব রচনা কিন্তু সেই ধারা অনুসারী নয়। একটা শান্ত মরমী হাতের করুণাস্নিগ্ধ স্পর্শ, শিল্পীর তুলি ও রঙের পেলবতায় তাঁর রচনার প্রতি ছত্র যেন অভিসিঞ্চিত। তবে নৈকট্য ছিল মূল লক্ষ্যে—নতুন কিছু করা, যুগযন্ত্রণাকে বিমূর্ত করে ভবিষ্যতের জন্য কিছু পাথেয় রেখে যাওয়া। ডঃ দিনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। "গোকুলের প্রতিভা ব্যভিচারী নহে। তাহা সমাজকে ভাঙিয়া ফেলিতে চায় না। কিন্তু যেখানে সমাজ পরের দুঃখে অন্ধ ও বধির এবং শুধু কোশাকুশিকে বড় করিয়া সত্যকে অস্বীকার করিতে চায়, সেখানে গোকুল শিল্পীর মত তাহার মন্ত্রপূত তুলিকায় এমনি ছবি অঙ্কিত করেন যে সমস্ত সংশয় আপনি দূর হইয়া সহজ সরল সিদ্ধান্তটি প্রাঞ্জল হইয়া পড়ে। এই তরুণ লেখক স্বর্গীয় মণীষা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যুতের প্রকাশ ক্ষণিক হইলেও তাহা জগৎকে প্রকাশিত না করিয়া ছাড়ে না। গোকুলের ছোট ছোট গল্পে তাহার প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টির এমন একটি সার্বভৌম প্রকাশ আছে, যাহাতে ছোট জিনিষের মধ্যেও বড় জিনিষ অনুভব করা যায়। আমাদের এই জরাজীর্ণ সমাজের পুনর্গঠনে সত্যসন্ধ এই তরুণ লেখক হয়ত বিশেষ সহায়তা করিতে পারিতেন। বড় দুঃখের কথা এই যে প্রকৃতির সুষমাময় এমন ফুলটি অকালে ঝরিয়া পড়িল। আমরা পাঠকবর্গকে এই গল্পগুলি বিশেষ প্রণিধান করিয়া পড়িতে অনুরোধ করি। এগুলি গতানুগতিক ও মামুলী নহে, শুধু সাময়িক প্রশংসার দাবী করে না। ইহার প্রত্যেকটি কাহিনীতে গোকুল মানুষের চিরন্তন ধর্মকে পরিবর্তনশীল সমাজনীতির উর্ধে তুলিয়া দেখাইয়াছেন। আমি গোকুলকে কয়েকবার দেখিয়াছিলাম। সেই ভাসা ভাসা দুটি চোখের পরিশ্রান্ত ও আবেশময় চাহনি ও মাথায় একরাশ চুল—একবার দেখিলে ভোলা যাইত না। তাহাকে কোন কল্পলোকের মানুষ বলিয়া মনে হইত। যাহাদিগকে সে দেখিয়াছিল তাহাদিগকে সে এরূপ নিবিড়ভাবে আপন করিয়া লইয়াছিল যে সেই আত্মীয়তার দরুণ পথিকের চরিত্রগুলির ছবি এইরূপ প্রত্যক্ষবৎ হইয়াছে। সে আসিয়াছিল নিজের দেশকে চিনিতে এবং দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিতে। এত বড় একটা

পূজার অর্ঘ্য সে সাজাইয়া আনিয়াছিল; ভগবান তাঁহার পূজারীকে পূজো করিতে অবসর দিলেন না।"

কল্লোল বেশিদিন বাঁচেনি। একদিকে প্রবল বিরুদ্ধবাদ অন্যদিকে উদ্দাম ভাববিলাস। বিবর্তিহীন সংগ্রাম ও দায়িত্বশূন্য বোহেমিয়ান স্বভাব এক সঙ্গে লালন পালন করা সম্ভব নয়। তাই অনেকেই মনে করেন কল্লোলের কলোচ্ছ্বাসে স্বাদু পানীয়ের চাইতে ক্লেদাক্ত পাঁকই ঘুলিয়ে উঠেছিল বেশী। প্রারম্ভিক পর্যায়ের বিস্ময় ও চমকের ঘোর কাটিয়ে ওঠার পরই অনেকে এর অন্তঃসারশূন্যতা, উচ্চকন্ঠে নিনাদিত অর্থহীন বাক্সর্বস্বতা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে উঠল। যে সকল প্রতিভাবান যুবক একদিন কল্লোলকে আশ্রয় করে নিজেদের সব সম্ভব অসম্ভব চিন্তাধারার বল্গাহীন বেপরোয়া প্রকাশে তৎপর হয়েছিলেন, চেতন-অচেতন, অবচেতন সব কক্ষের আনাগোনাকেই বাঙ্ময় করায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাঁরা অনতিবিলম্বে স্ব-স্ব ধর্ম খুঁজে পেয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন অন্যতর ক্ষেত্রে, অন্য দিগন্তে বিস্তারিত হলেন, পেলেন লক্ষ্মী সরস্বতীর অকৃপণ দাক্ষিণ্য।

তবু কল্লোলের আবির্ভাব ও সাধনা একেবারে নিষ্ফল নিরর্থ হয়নি। তাঁদের যৌবন উচ্ছলতা, সৃষ্টি সুখের উল্লাস, অনেকের মনেই দোলা দিয়েছিল। নবতর ভাবনায় ভাবিত, অন্য এক চেতনায় উদ্দীপ্ত হতে সাহায্য করেছিল। মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ, নজরুল তাঁদের নতুন ভাবনারাজি, বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী এই কল্লোলের পাতাতেই ব্যক্ত করেছিলেন উপযুক্ত ক্ষেত্র ও আধার পেয়ে। সাহিত্যের বিতর্ক সভায় শ্লীলতা অশ্লীলতার বিরোধ মীমাংসায় কল্লোল টেনে এনেছিল রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র এবং আরো অনেককে। সাহিত্যের প্রথা প্রকরণ, ঐতিহ্য আদর্শ সম্বন্ধে নতুন করে মূল্যায়ণ পর্বের সূচনা করেছিল। অগভীর এবং কিছুটা অস্বচ্ছ হলেও সাম্যবাদী ধ্যান ধারণা, পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র, মনোবিজ্ঞান, যৌনতা এসব নিয়ে যুক্তি ব্যাখ্যা এরাঁই আমদানি করেছিলেন আমাদের সাহিত্যে অনেকটা মোহমুক্ত মন নিয়ে। জীবন ও জগৎ, সমাজ ও সংসারকে নতুন আলোকে দেখার, বিচার করার প্রেরণা সঞ্চার করেছিল অনেক সাধারণ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। আর হয়ত গোকুলের কাম্য ছিল এইটুকুই। কিছু একটা করা, যাতে ভবিষ্যতের সাহিত্যপ্রয়াসীরা খুঁজে পায় পথের নিশানা আর উৎসাহিত হয় নানা অজানা দিগন্ত উন্মোচনে।

তাঁর নিজের সামান্য রচনার মধ্যে রয়েছে উপন্যাস 'পথিক', কয়েকটি কবিতা ও কথিকা, জাঁ ক্রিসতফের আংশিক অনুবাদ, ছোটদের জন্য গুটিকয়েক রচনা আর অনবদ্য গল্পগুলি, যার বেশির ভাগই 'মায়ামুকুলে' সংকলিত। তবে তাঁর সাহিত্যকৃতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে পথিক উপন্যাসে আর মায়া-মুকুলের কয়েকটি গল্পে, যা সাহিত্যিকের সভাতেও তাঁকে একেবারে অপাংক্তেয় হতে দেবে না। রূপরেখায় সংকলিত গল্পগুলির অধিকাংশই পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে নি। ছোট গল্পের আভাস রয়েছে। সার্থক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল প্রচুর কিন্তু পরিপূর্ণ নিটোল হয়ে দেখা দেয় নি। রঙ ও তুলির সাহায্যে যেন এক একটি চিত্র তুলে ধরেছেন, ক্ষণিকের চিন্তাকে মূর্ত করে তুলেছেন। তাৎক্ষণিক একটা বেদনা, একটা বিশেষ মুহূর্তের অনুভূতিকে ধরতে চেয়েছেন শিল্পীর তুলিতে। কিন্তু জীবনের কোন চিরস্থায়ী ভাষ্য হয়ে রূপলাভ করেনি, ব্যথিত অন্তরের ক্ষোভ ও অসুস্থতার প্রতীক যেন এই সব গল্প। অচিন্ত্য কুমার এই সব গল্প সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'তাতে অর্থের চাইতে ইঙ্গিত থাকত বেশী। যার মানে দাঁড়ি কমার চাইতে ফুটকিই অধিকতর...'

পথিকের মধ্যে গোকুল নাগ সেকালের যুবক যুবতীদের ভাবনাকে অনেকটাই রূপায়িত করতে চেয়েছেন। গতানুগতিক ছকে বাঁধা উপন্যাস এটি নয়, শুধু চলার, শুধু গতির আনন্দ। সেই চলা, সেই গতি যেন নদীর প্রবহমানতা। সব কিছু জীর্ণ, অচলকে প্রাণের পরশে সজীব করে তোলা। মেয়েদের নিজস্বতা, স্বাধীন সত্তা এসব বিষয় নিয়ে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ মাইকেল শরৎচন্দ্র সকলেই কম বেশী আলোড়িত হয়েছিলেন। তাদের পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা, মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিয়ে পূর্বসূরী সকল সাহিত্যিকই আলোচনা করেছেন। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় নারীজীবনের অনেক কামনা বাসনা নিয়ে সাহিত্যের আসর কাঁপিয়েছেন কিন্তু পথিকের 'মায়া' যেন আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে এসেছে। কথায় চলায় কোন দ্বিধা বা সংশয় নেই তার মনে। সে ফ্রয়েড, হ্যাভলক এলিস শুধু যে পড়েছে তাই নয় সেটা সোচ্চারে প্রকাশ করতেও কোন কুণ্ঠা তার নেই। কিন্তু কোন নিষিদ্ধ কাজ বা গোপন কোন অভিসারে প্রবৃত্তি নেই, কারণ সামাজিক অনুশাসন, এই নৈতিকতার বেড়াজালকে সে কৃত্রিম ও অমানবিক মনে করে। শুধু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বলেই পুরুষ তার কর্তৃত্ব খাটিয়ে যাবে এই মত সে অগ্রাহ্য করে। অমান্য করে এই স্বার্থপ্রণোদিত রীতি

নীতিগুলোকে। ব্রাহ্ম পরিবারের প্রগতিশীল পরিবেশে সে আবাল্য লালিত, তাই হিন্দু সমাজের এই নিপীড়ক বিধান সমূহকে অতি ঘৃণার চোখেই দেখে। অথচ সে কোন উচ্ছৃঙ্খল বা যথেচ্ছাচারী জীবন যাপন করে নি। নারীসুলভ কোমলতা বা মাধুর্যের কোন ঘাটতি ছিল না মায়ার মধ্যে। তার উক্তি, 'যে মা কলঙ্কের ভয় করে, সে মা নয়। লাগুক, কত কলঙ্ক লাগবে আমার গায়ে। ওরা আমাকে একেবারে কালো করে দিক', প্রমাণ করে নিজের জীবনধারার প্রতি তার ছিল প্রশ্নহীন প্রত্যয়। এই মায়া এবং বন্ধুবর্গ, যা নতুন পথের পথিক সব কিছুকে যাচাই করে। সত্যের আলোকে যুগ ভাবনার কষ্টি পাথরে পরখ করেই চলার পথ বেছে নিয়েছে। কাজেই একটা সংঘাত অনিবার্য এবং সেই আভাসটুকু দিয়ে সেই ইঙ্গিত রেখেই গোকুল এই উপন্যাস রচনা করেছেন। মায়ার মা সুবর্ণ যেমন রক্ষণশীল তেমনি মাসী করুণা নূতন যুগের সংস্কারমুক্ত মহিলা। শ্রীশ, দীপ্তি, কল্যাণী সকলেই এই নতুন পথের পথিক।

উপন্যাস হিসাবে পথিক কোন উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি নয়, কিন্তু লেখার স্টাইল, বলিষ্ঠতা, ভাবপ্রকাশের অসংকোচ ভঙ্গী অনেকেরই সম্ভ্রম আদায় করেছিল, যাঁদের মধ্যে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের অকৃপণ উদার প্রশস্তি বিশেষ উল্লেখ্য। দীনেশচন্দ্র উগ্র আধুনিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। ঐতিহ্যানুসারী ধর্ম-বিশ্বাসী সাহিত্য সাধক হিসাবেই তাঁর পরিচিতি। তাই তাঁর অকুন্ঠ এই প্রশস্তি তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মহলেও পথিক যে সুপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তারই নিদর্শন। 'মায়ামুকুল' গল্প-সংগ্রহের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, 'পথিক পড়িয়া যে গোকুলকে পাইয়াছিলাম, মায়ামুকুলে আবার যেন তাহাকে ফিরিয়া পাইলাম।' 'কল্লোল যুগে' বর্ণিত আছে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখে-ছিলেন, 'গোকুলের পথিক পড়া শেষ করেছি। বইখানিতে সবচাইতে আমার দৃষ্টি পড়েছে একটা কথার উপর। লেখক বাংলার ভাবী সমাজটার যে পরিকল্পনা করেছেন তা দেখে বুড়োদের চোখের তারা হয়ত কপালে উঠতে পারে; হয়ত অনেকে সামাজিক শুভ চিন্তাটাকে বড় করে দেখে মনে করতে পারেন এরূপ লেখায় প্রাচীন সমাজের ভিত ধসে পড়বে।... যে সকল বীর আমাদের ঘরদোর জোর করে খুলে দেওয়ার জন্য লেখনী নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন তন্মধ্যে কল্লোলের লেখকরা সর্বাপেক্ষা তরুণ ও শক্তিশালী। প্রাচীন সমাজের সহিত একটি সন্ধি স্থাপন করার দৈন্য ইহাদের নাই। নিজেদের প্রগাঢ় অনুভূতি, সত্যের প্রতি

অনুরাগ প্রভৃতি গুণে একান্ত নির্ভীক ; ইহারা মামুলী পথটাকে একেবারে পথ বলিয়া স্বীকার করে না। ইহারা যাহা সুন্দর, যাহা স্বাভাবিক, যেখানে প্রকৃত মনুষ্যত্ব তাহা প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই আত্মার স্ব-প্রকাশিত সত্যটাকে ইহারা বেদ কোরাণের চাইতে বড় মনে করেন। এই সকল বলদর্পিত মর্মবান লেখকদের পদভারে প্রাচীন জরাজীর্ণ সমাজের অস্থিপঞ্জর কেঁপে উঠবে। কিন্তু আমি এঁদের লেখা পড়ে যে কত সুখী হয়েছি তা বলতে পারি না। আমাদের মনে হয় ডোবা ছেড়ে পদ্মার স্রোতে এসে পড়েছি, যেন কাগজ ও শোলার ফুল-লতার কৃত্রিম বাগান থেকে নন্দন কাননে এসেছি।" পথিক ও তার স্রষ্টা গোকুল নাগ সম্বন্ধে এর চাইতে বড় প্রশস্তি আর কি হতে পারে!

আর একজন সাহিত্যের ইতিহাস লেখক ডঃ সুকুমার সেন 'পথিক' সম্বন্ধে লিখেছেন, গোকুলচন্দ্রের মুখ্য রচনা পথিক। উপন্যাসটিতে লেখকের দৃষ্টিতে যেন পথিক জীবনের চলচ্চিত্র ধরা পড়িয়াছে। সাধারণ উপন্যাসের সংহতি নাই। কিন্তু ভূমিকাগুলির উজ্জ্বলতায় এবং সংসার চিত্রের বাস্তবতায় কাহিনীর সে ত্রুটি ধরা পড়ে না। 'পথিক' আধুনিক উপন্যাসে পথিকৃৎ। দুই কালের দুজন বিশিষ্ট সাহিত্যাচার্যের এই প্রশস্তি নিঃসন্দেহে গোকুলের প্রতিভা ও ক্ষমতার সাক্ষ্যবাহী।

তাঁর স্মরণীয় অন্য সৃষ্টি, মায়ামুকুলের অন্তর্গত গল্পগুলি।

গোকুলের প্রথম দিকের গল্পে যে ইঙ্গিতময়তা, প্রাতিভাসিকতার প্রাধান্য ছিল তা অনেকখানিই কাটিয়ে উঠেছিলেন পরবর্তী পর্যায়ের গল্পে। তখন শিল্পীর স্কেচকে ছাপিয়ে দেখা দিত ভাস্করের গাম্ভীর্য যা বহুল পরিমাণেই জীবননিষ্ঠ ও বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন। 'দেবতার গ্রাস' এমন একটি গল্প। এই নামের রবীন্দ্র কবিতাটি নিয়তি-কবলিত সামাজিক কুসংস্কারের এক করুণ কাহিনী। ভাষাহীন বেদনায় আমরা নির্বাক হয়ে যাই কিন্তু কোন মর্মদাহী জ্বালা অনুভব করি না। যদিও ধর্মীয় অন্ধ কুসংস্কার ও হীন স্বার্থপরতা এই কাহিনীর নিয়ামক শক্তি, অন্তিমে কবিতা পাঠের শেষে এক ভাষাহীন বেদনায় আমরা আচ্ছন্ন হয়ে যাই। কিন্তু গোকুল নাগের 'দেবতার গ্রাসে' মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয়, মূল্যবোধের অপচিতি অতি নিষ্করুণভাবে চিত্রিত, মানুষী সত্তার ক্রমাবলুপ্তি স্তরে স্তরে উদ্‌ঘাটিত।

মহেশ রায় বিত্তবান, সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম আর অটুট কর্মদক্ষতায় রায়

সাহেব হয়ে উঠেছিল সকলের কাছে। তারই অনুগ্রহে নিকট সম্পর্কের এক ভাইকে ক্যাশিয়ারের চাকরি দিয়েছিলেন নিজেরই কর্মস্থলে। কিন্তু উপকারের বিনিময়ে সেই ভাই মহেশ রায়ের নামে প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করে, ফলে অপমান আর লাঞ্ছনা নিয়ে তাকে চাকরি ছাড়তে হয়। স্ত্রীর গয়না গাড়ী এমন কি বসত বাড়িটি বিক্রী করে তাকে ঋণমুক্ত হতে হয়। আর সেই বাড়ি কিনে নেয় একদা তারই আশ্রিত ক্যাশিয়ার ভাই। কিন্তু এই শোক তার সহ্য হয় না ফলে ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় মহেশ রায়। পাড়ার লোকেরা দুই মহেশ রায়ের কথা ভাবে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। গোকুলের ভাষায়, 'যখন দেখা যায় গগন চুম্বী ছায়া-ঘন তরু তার বিস্তীর্ণ শাখা-প্রশাখা পত্র মঞ্জরী নিয়ে মাটির বুক ভরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সহসা তার সমস্ত সজীবতা হারিয়ে ফেলেছে—ডাল পড়েছে নুয়ে, পাতা গেছে দুমড়ে, রস গেছে শুকিয়ে—মানুষের বুক হায় হায় করে ওঠে। মহেশ রায়কে দেখে, সবার বুকে সেদিন ঠিক এমনি একটি হাহাকার জেগেছিল।' তারপর যা ঘটার তাই ঘটল। শোকগ্রস্ত মহেশ রায় নাবালক পুত্র অসীম ও অসহায়া স্ত্রীকে রেখে মারা গেলেন।

অসীমের মাও কিছুদিন পরে মারা গেলেন আর অসীম বড়লোক কাকার সংসারে, এককালে নিজেদের বাড়িতেই অতি অবহেলা আর নিপীড়ণে মানুষ হতে লাগল। সে আর ধনী লোকের ছেলে নয়, ধনীর আত্মীয়। ধনী আত্মীয়ের বাড়ীতে দরিদ্র সন্তান যে-ভাবে মানুষ হয়, অসীমের তার কিছুরই ব্যতিক্রম ঘটল না।

'এমনি করে প্রায় আট বছর কেটে গেল। অসীম লেখাপড়া কিছুই শিখল না। সৌখীন বা ভদ্র ভাবটার চিহ্ন তার শরীর মন থেকে মুছে গেছে। ধনী ভাইরা ভাই বলে পরিচয় দিতে কুন্ঠাবোধ করে।' তারপর সেখান থেকে অন্য জায়গায় সে চলে যায়, বালিমাটিতে কারখানার শ্রমিক। যাবার আগে পাড়ার সবার সঙ্গে দেখা করে সে। হরি গয়লা, শ্যাম ময়রা, নফর ধোপা, চন্ডী কলু সবার বাড়ি গিয়ে বলে গেল—'আমায় ভুলে যাস্ কিন্তু আমার মা বাবাকে ভুলিস না।'

নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশে নতুন জন্ম হল তার। এই কারখানা যেন পাতালপুরী। চারপাশে আগুন, বিরাট দৈত্যের মত সব যন্ত্র। কলের মুখ দিয়ে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে আসছে…এখানকার মানুষরাও যেন এক

একটি যন্ত্র বিশেষ। তাদের শরীর যেন রক্ত মাংসের নয়, সে লোহা হয়ে গেছে।' তারপর 'বছর না ঘুরতে ঘুরতে অসীমের নাম হল অসি মিস্ত্রী। তার গলার স্বর হল ভারী, কর্কশ, ভাষা হল ছোটলোকের মত। সে খইনি খায়, যখন তখন থুতু ফেলে, গালাগাল দেয়। সভ্য সমাজের সমস্ত চিহ্ন লোহার কলে ঢালাই হয়ে সম্পূর্ণ নূতন রূপ নিয়ে উঠল। অসীমও হয়ে গেল লোহার মানুষ। রঘু কামারের ছেলে গোপালের বাড়িতেই আশ্রয় জুটল তার। এখানে থাকাকালীন সময়ে ঘটনাচক্রে বিয়ে হয় শিউলির সংগে। কারখানার কঠিন নীরস জীবন শিউলির সান্নিধ্যে কোমল ও স্নেহময় হয়ে ওঠে। দুজনে নিবিড়ভাবে ভালবেসে অনুভব করে জীবনকে নতুনভাবে। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ, তাই কাজের সময় অকস্মাৎ একজন কারিগরের হাতুড়ি তার মাথায় এসে পড়ে আর সজ্ঞাহীন অবস্থায় সে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। অবিরাম চলে অসি মিস্ত্রীর চিকিৎসা কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসে না। কারখানার ম্যানেজার এসে হাসপাতালে পাঠাতে চাইলেন। কিন্তু শিউলি বলে, 'প্রাণ থাকতে আমি ওকে ছেড়ে দিতে পারব না।' তারপর অগত্যা সেই দৈবী কৃপা! পাশেই কানাইসোল, সেখানের বাবা বিশ্বনাথ বড় জাগ্রত দেবতা। শিউলিকে পরামর্শ দেয় সকলে, "দাঁতে কুটো নে' বাবার দোরে হত্যে দে' পড়। বুক চিরে রক্ত দে, বাবার পা ধুইয়ে দে।" স্বামীর আরোগ্য লাভের আশায় নিরুপায় শিউলি তাই যায় পায়ে হেঁটে অনেক কষ্ট করে। সন্ধ্যা হয়ে যায়। কিন্তু অসম্ভব ভিড়ে বাবার মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে পারে না। চাতালেই ক্লান্ত অবসন্ন দেহে বসে থাকে। পুণ্যার্থীরা সব চলে গেলে পুরোহিতের দৃষ্টি যায় শিউলির দিকে। সব বৃত্তান্ত জানার পর ঠাকুরের একনিষ্ঠ পূজারী বলে, 'আরে পাগলী, দেবতার খুসীর ওপর হাত বাড়াতে চাস, কিন্তু সে কি এত সহজে হবার, জীবনের বিনিময়ে জীবন বলি দিতে হয়।' তারপর রাত্রির অন্ধকারে দেব সেবায়েতের কাছে চরম মূল্যই দিতে হয় তাকে, বিনিময়ে সে পায় প্রসাদী নির্মাল্য এবং তাই নিয়ে শিউলি ফিরে আসে অচৈতন্য স্বামীকে সুস্থ করে তুলতে। রাত্রি শেষে অসীমের জ্ঞান ফিরে আসে, কিন্তু শিউলি তার অশুচি দেহ নিয়ে যেতে পারে না স্বামীর কাছে, তাই কাছে গিয়েও সরে আসে। তার যেটুকু সম্পদ ছিল সবই তো দেবতা গ্রাস করে নিয়েছে। উচ্ছিষ্ট দেহ মন নিয়ে তো আর স্বামীর সেবা করা যায় না তাই শিউলিকে সরে যেতে হয় পৃথিবী থেকে। ভাল হয়ে অসীম খুঁজে বেড়ায় তাকে, হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে দেখল

সর্ব কলুষনাশিনী নদী, লজ্জায় ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে দূরে বহুদূরে সরে গেছে। আর মাটির কলংক গায়ে মেখে মাটির ওপর মুখ গুঁজে পড়ে আছে মাটির মেয়ে। যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আমাদের সমাজ জীবনে যে পচন শুরু হয়েছিল, কলকারখানার অগ্রগতি ধীরে ধীরে সকল মূল্যবোধকে যে গ্রাস করে ফেলেছিল এই গল্পটি যেন তারই রূপালেখ্য। কিন্তু স্বভাব অনুযায়ী গোকুল শুধু এঁকেই গেছেন, তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। কোন মন্তব্য বা নিজস্ব মতামত সোচ্চারে ব্যক্ত করেন নি। গোটা গল্প জুড়েই রয়েছে একটা থমথমে ভাব।

গোকুলের গল্প সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও, অবশ্য বেশি লেখার মত আয়ু তিনি পাননি, বিষয় বৈচিত্র্যে দীন নয়। তাছাড়া সমাজের নীচুতলার ও একেবারে নিম্ন মধ্যবিত্তদেরই দেখা যায় তাঁর গল্পে।

'ব্যথার প্রদীপে' মনোহর দাশ গংগার উপর এক জেটির ক্রেন মিস্ত্রীর কাজ করত। মাইনে পেত গোটা চল্লিশ টাকা। রাতে ওভার টাইম খেটেও বিশ পঁচিশ টাকা সে উপায় করত। মদের বোতল আর কাজের নেশা ছিল তার একমাত্র সংসারের বন্ধন। কাজেই অবস্থা বেশ সচ্ছল হলেও এই টাকাগুলোর বেশীর ভাগ গিয়ে পড়ত গুরুচরণ সাহার তহবিলে আর ভজহরির চাটওয়ালার দোকানে।

এই মনোহর দাশের বিয়ে হল রংগনের সংগে কোন আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির মধ্য দিযে নয়। নেহাতই পরিচয় আর ভাললাগার মধ্য দিয়ে। রংগনও ঘরে আবদ্ধ থাকার পাত্রী নয়, সে পাড়ার সকলের সংগেই অবাধে মেশে, মনোহর দাশের বাড়ী যেন সাময়িক একটা আস্তানা। দেহগত কোন বাছবিচার তার নেই, তখনো প্রেমের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়নি তার মন। যথাকালে সে সন্তানের মা হল এবং সেই সন্তানকে ঘিরে মনোহরের অনেক আশা আকাংক্ষা। সময় পেলেই আদরে চুম্বনে ভরিয়ে দেয় সেই ছোট শিশুকে। কিন্তু রংগনের মনে আশংকা, অনিশ্চয়তা এই শিশুর পিতৃত্ব নিয়ে। একদিন এমনি আদর করার সময় রংগন উন্মাদিনীর মত এসে বলে, 'উ তুর লয়-তুর লয়-তুর লয়—' কিছু বুঝতে না পেরে মনোহর বলল, 'তবে'? রংগন কেঁদে উঠে বলল—আমি জানি না।

তার গলার স্বর বন্ধ হয়ে এল। তারপর সে মনোহরের পায়ের ওপর মাথা ঠুকে ঠুকে বলতে লাগল—আমাকে মেরে ফেল, কেটে কুটে থেঁতো করে ফেল, আমি—

মনোহরের সংশয় কেটে গেল। সে রঙ্গনের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—ই কতা তুই জানিস না। কিন্তুক আমি বলচি উ আমার। আর তুকে মেরে কেটে কি হবে রঙ্গন ? ই কতা যদি সত্যি নাও হয় তবু তুই যে আমাকে ভাঁড়ালি সে কতা কি কুনদিন তুই ভুলতে পারবি ?—ই যে মারের বাড়া রঙ্গন—লে ধর ছেলেটা কানতে লেগেছে, আমি কাজে যাই।'

এই গল্পটি সম্বন্ধে বিদগ্ধ সমালোচকের মন্তব্য, "সমস্ত সংশয় ও সংস্কারের বাধা অতিক্রম করিয়া স্নেহ আসিয়া সমস্যার সমাধান করিয়া দিল। লেখক নিজের মনের কথাটি বলেন নাই ; কিন্তু তিনি এ কাহিনী বলিতে যাইয়া সুস্পষ্টভাবে যে ইঙ্গিত দিয়াছেন তাই এই সার্বভৌমিক নীতি সকলের স্বীকার্য হইবে যে, যদি হৃদয়ে স্নেহের সিংহাসন পাতিয়া বসে, শত অপরাধ সংস্কার ও সংশয় তাহাকে সে সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।—লেখক তাহা স্মৃতিকারের মত ব্যাখ্যা করেন নাই। কবির মত মর্ম্ম ছুঁইয়া করুণ কথায় তাহা বুঝাইয়াছেন, চিত্রকরের মত ছবি আঁকিয়া সে সত্যটি চোখের সামনে দাঁড় করাইয়াছেন।"

'শেষ কথা', 'ঝরাপাতা,' 'ঝড়ের রাতে' প্রভৃতি গল্পে অল্প কথা, সামান্য চমক আর ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনা। যে ফুটকির কথা তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'মরীচিকার মত গল্পে তার খুবই প্রাধান্য। "না-না, ব্যস্ত হয়ো না, তুমি বস। মানুষের শ্রদ্ধা আর সম্ভ্রমের চাপে আমি একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছি। আর পারি না। থাক না আমার গায়ে এই সব সোনা মুক্তোর গয়না, হলই বা এটা বেনারসী সাড়ী, তুমি দেখো না এসব কিছু—তোমাব নাম কি ভাই ?

আমি ?—আমি তৃপ্তি।

তৃপ্তি ?……বেশ নামটি।

না জিগগেস করতেই আমার পরিচয় দিই—আমি ঝরণা, ভারি বকতে ভালবাসি। আমার কথা আর কিছুতেই ফুরায় না,……কিন্তু এত কথার পরেও দেখি কিছুই বলা হয়নি। তুমি হাসি, তুমি তৃপ্তি, তুমি স্বপ্ন…আর আমি ? হাসি পায়—নিজের কথা মনে হলে…আমি রাণী আমার গলায় যে মুক্তোর মালার ছড়াটা রয়েছে ওরই দাম শুধু ছাই দাম। কি হবে আমার ওতে ?" এসব গল্পে গোকুল নিজে বলেছেন কম, বলিয়েছেন বা বলাবার চেষ্টা করেছেন বেশী।

আর দুটি গল্পের উল্লেখ না করলে তাঁর প্রতি অবিচার হবে। 'বসন্ত বেদনা' আর 'সোনার ফুল'। একটিতে অবদমিত কামনা এক মুক্ত স্বাভাবিকতায় রূপান্তরিত। অন্যটিতে মনের অবরুদ্ধ ভালবাসার পরিণতি ঘটল চরম ত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে।

ধনঞ্জয় বৈরাগী কাশীপুরের গোলাবারুদের কারখানার একজন প্রধান মিস্ত্রী। তার দুটি ভাইও কাজ করত কিন্তু অকস্মাৎ তার মারা গেল। সে একা কাজ করে আর ভাবে সকলের জন্যই সে চিন্তা করে তবে ভাগ্য এত বিরূপ কেন। মানুষকে সে ভালবাসে তাই গোলাবারুদের কারখানায় কাজ করতে করতে তার হাসি পেল। যে মানুষকে বাঁচাবার জন্য তার আগ্রহের অন্ত ছিল না সেই মানুষেরই ধ্বংসের জন্য সে কাজ করছে। 'ইচ্ছে হল এ কাজ ছেড়ে দেয়। কিন্তু দিল না, একান্ত নির্বিকার ভাবেই সে দিনের পর দিন কাজ করতে লাগল।' তারপর রূপসীকে বিয়ে করে, এবং সুখে দিন কেটে যায়। মাতাপিতৃহীন একটি শিশু গৌরকে আশ্রয় দিল, যে তার স্ত্রী রূপসীকে নিজের মায়ের মতই ভালবাসে। তারপর তার নিজের একটি মেয়ে হয় সুরভি। এর পর হঠাৎ রূপসী মারা গেল আর কিশোর গৌরও বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। রূপসীর বড় আদরের ধন এই গৌরকে অনেক সন্ধানের পরও পাওয়া গেল না। এদিকে সুরভি বড় হতে থাকে। অনেক খোঁজ করে কোন্নগরের প্রসন্ন জানার ছেলের সঙ্গে সুরভির বিয়ে দিল। 'ঘর বর দুইই ভাল। নগদ পয়সা, জমি জমা কিছু আছে। মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না। ছেলেটি ইলেকট্রিকের কাজ করে, সুরভি সুখেই থাকবে।' অনেক আশা নিয়ে গৌর একমাত্র মেয়ে সুরভির বিয়ে দিল। 'কিন্তু ভাঙ্গন একবার যখন ধরে, তখন মানুষের শত চেষ্টাতেও কিছু হবার নয়। বাঁধ বাঁধা—সেও দৈবের সঙ্গে লড়াই। বছর না ঘুরতে সুরভি বিধবা হল। ধনঞ্জয় যেন জীবন নিয়ে যমের সঙ্গে দাবা খেলতে বসে-ছিল, একটির পর একটি ঘুটি তার গেছে। আজ সে কিস্তিবন্দী। একমাত্র মেয়ের এই শোচনীয় পরিণাম সে সহ্য করতে পারে না। সেইদিন জীবনে প্রথম ধনঞ্জয় একটা ভাঁটিখানায় গিয়ে খুব খানিকটা ধেনো মদ খেয়ে, পথের ধারে আবর্জনার উপর পড়ে সমস্তটা রাত কাটিয়ে দিল। তারপর থেকে এই মদের নেশা তাকে ছাড়তে চাইলেও সে ছাড়ল না। 'আর কিছুই তার আশা করবার নেই, কিছু ভাববার নেই, একটি মাত্র কাজ—মরণের পথ চেয়ে থাকা।' কয়েক

বছর এভাবে কেটে যায়, সুরভি বড় হয়, দেহে মনে জাগে যৌবনের শিহরণ। এমন একদিনে হঠাৎ গৌর ফিরে আসে। ধনঞ্জয় গৌরকে দেখে আর ভাবে—গৌর আমার ঠিক আগের মতই আচে—রূপসীর খাম-খেয়ালী পাগলা ছেলেটা।

শক্ত হাতে সে সংসারের হাল ধরে। কিন্তু সেও ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয় পরিপূর্ণ যৌবনা সুরভির প্রতি, তার আচার আচরণে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুরভির মনেও দোলা লাগে কিন্তু কোন অসাবধানতায় এতটুকুও প্রশ্রয় দেয়না গৌরের এই নতুন উপসর্গকে। এমন অবস্থায় রুগ্ন বয়স্ক অসহায় বিহারীর রোগ-শয্যায় সুরভি নতুন ভূমিকায় নেমে আসে। দিনরাত সেবা যত্ন করে বিহারীকে সারিয়ে তোলে। বিহারী সুরভিকে ডাকে মা বলে। যে যৌবনের হাতছানি তাকে এক অন্ধকার পিচ্ছিল পথে নিয়ে যাবার জন্য উন্মুখ ছিল তাকে বশ করে মাতৃত্বের চেতনায় জন্ম নিল তাব নতুন সত্তা। গৌরও সুরভির প্রতি তার মনোভাব পাল্টাল এবং দুজনে আগের মতই হাসি গল্পে সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে লাগল। গল্পটিতে বস্তুনিষ্ঠ জীবনের পরিচয়কে ছাপিয়ে বিরাজ করছে নির্বস্তুক অনুভবের মূর্ছনা। এই হল 'বসন্ত বেদনার' অন্তর্লীন করুণ মধুর রূপব্যঞ্জনা।

আর 'সোনার ফুলের' অপর্ণা একটি আধুনিক রুচি পরিকল্পিত আদর্শ। সতীত্বই রমণীর ভূষণ, স্বামী একমাত্র দেবতা—প্রভৃতি শ্লোক দিয়া এই সতীকে তৈয়ারী করা হয় নাই। তিনি স্বামীকে দেবতা বলিয়া জানেন নাই, দেবতার দান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাথায় যদি বাজ পড়ে, হঠাৎ যদি সাপে কাটে, তবে তাহাও যেরূপ ভগবানের দান, অপর্ণা তাহার স্বামী গোবিন্দকেও সেইরূপ ভগবানের দান বলিয়া জানিয়াছিলেন। জন ওয়েবস্টারের ভাষায় বলা যাইতে পারে, তিনি তাহার স্বামীকে চিনিয়াছিলেন যেরূপ জাহাজের ক্রীতদাস তাহার ক্ষেপনীকে চিনে। সে যে দাঁড়ের সঙ্গে বাঁধা, তাহা না টানিয়া যে উপায় তাহার নাই। 'কিন্তু অপর্ণার দেহে ও মনে যৌবনের লীলাতরঙ্গ নির্বাধ খেলা করিতেছিল।……আহত পাখীটির মত মোহনের পায়ে পড়িয়া সে তাহার সমস্ত ব্যথার ভার সেখানে রাখিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছিল।' কিন্তু তাহার দেহ ছিল সংযমে সুরক্ষিত, তাহার মনের ভালবাসা ছিল দেবদত্ত আনন্দ। তাহা কখনই পাপ নহে। তাহা চির-নিষ্কলঙ্ক। মোহনের প্রতি ফল্গু নদীর মত অন্তঃসলিলা প্রীতি কখনই অপরাধ হইতে পারে না।" ভাষাচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের এই উক্তি

আমাদের মনে করিয়া দেয় গোকুলচন্দ্র সাহিত্যিক বিদ্রোহী হলেও কোনমতে ব্যভিচারী ছিলেন না। কারণ অবৈধ প্রেম, অর্থাৎ সমাজ যে প্রেমকে স্বীকৃতি দেয় না, তা নিয়ে কখনো বাড়াবাড়ি করেননি। গল্পের পরিণতিটি খুবই ব্যঞ্জনাময়, ভাবে ও ভাষায়। জীবনের অন্তিম লগ্নে নির্যাতিতা অপর্ণা যখন সব বাধা তুচ্ছ করে মোহনের ঘরে এল তখন তার জীবনশক্তি প্রায় লুপ্ত। যে প্রেম যে ভালবাসা এতদিন ধরে বুকের মাঝখানে লালন করে এসেছে মৃত্যুর লগ্নে তাকে প্রকাশ করতেই হল সেই প্রেমের মর্যাদা রাখতে। "মোহন ভুলিয়া গেল বিশ্ব-জগতকে, ভুলিয়া গেল পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক. সমাজ আর যা কিছু সব। ভুলিয়া গেল আপনাকে, তাহার শেষ শক্তিও যেন চলিয়া গেল। সে শুধু চাহিয়া রহিল সেই অস্পষ্ট নারী মূর্তিটির দিকে।...

ঘরের মধ্যে কাহার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হইল।...মোহনের চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে অতি সন্তর্পণে তাহার টেবিলের উপর হইতে একটি দিয়াশলাই লইয়া আসিয়া জ্বালিল।...মাগো! অন্ধকারের আবরণের মধ্যে একি রক্তস্রোত বহিয়া চলিয়াছে। এ যে সর্বংসহা জগৎমাতার বুকের রক্ত।...বুকের স্পন্দন এখনও থামে নাই।...নিবিড় কালো কেশের তলায় যেখানে রক্তের উৎস জাগিতেছে, তাহারই উপর শিশির বিন্দুর মত হীরার টুকরা বুকে লইয়া পাপড়ি মেলিয়া ফুটিয়া রহিয়াছে সোনার ফুল! আলো নিভিয়া গেল।" একটি নিখুঁত করুণ চিত্র। গোকুল যে ছবি আঁকতেন তাই যেন ভাষায় এই রূপ লাভ করেছে, সঙ্গে রয়েছে কবির কল্পনা ও বর্ণনা।

পথিক লেখার সময় থেকেই আক্রান্ত হয়েছিলেন সেকালের একান্ত দুরারোগ্য যক্ষারোগে। আর্থিক অসচ্ছলতা ক্রমবর্ধমান। না লিখে, না এঁকে প্রাণ-ধারণই সম্ভব নয়। পুনায় চাকরি করার সময় এই রোগ এত মারাত্মক হয়েছিল যে বোম্বের এক স্যানাটোরিয়ামে থাকতে হয়েছিল কিছুদিন। কিন্তু সেখানে থেকেও শান্তি নেই মনে, কলকাতার জন্য প্রাণ কাঁদে। মৃত্যু যখন অবধারিত তখন মরবেন প্রাণের কলকাতায়, আত্মীয়প্রতিম বন্ধুদের সান্নিধ্যে, কল্লোলের উষ্ণতায়। এর উপর একটা পারিবারিক বিপর্যয় এসে দেখা দিল। শ্বশুরবাড়ী থেকে বিতাড়িতা বিধবা দিদি ও তার সন্তানদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার নিতে হল। এই পরিশ্রমে সেই মারাত্মক ব্যাধি আরও মারাত্মক হয়ে দেখা দিল। স্থির হল দার্জিলিং স্যানাটোরিয়ামে তাঁকে নিয়ে চিকিৎসা করা হবে। অগ্রজ কালিদাস

নাগ বিদেশ থেকে ডক্টরেট হয়ে ফিরেছেন। তাই মনে অনেক শান্তি কিন্তু দেহের অশান্তি প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছে। অভিন্নহৃদয় বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্গী হলেন দার্জিলিংএ। এখানে অসুস্থ অবস্থায় পথিকের প্রুফ আসত তাঁর কাছে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় পড়ে শোনাতেন, মুখে মুখে চলত পরিবর্তন, পরিমার্জন। কলকাতায় হঠাৎ খবর এল গোকুলের অবস্থা খুবই গুরুতর। অগ্রজ কালিদাস নাগ, অগ্রজাধিক দীনেশরঞ্জন ছুটে গেলেন। দাদাকে প্রণাম জানিয়ে, দীনেশের হাত ধরে উচ্চারণ করলেন আজীবন স্বপ্নের বাণী, 'আমি থাকব না। কিন্তু কল্লোলকে রেখো তোমরা সবাই মিলে।' অচিন্ত্য কুমারের মরমী লেখা থেকে এসব তথ্য আমরা জানতে পারি। আরো জানতে পারি সামসময়িক সকল জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরাই গোকুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ-ছিলেন।

অনেকেই স্বপ্ন দেখেন, কিন্তু গোকুল নাগের স্বপ্ন কখনো বিলাস মাত্র ছিল না। তাঁর প্রাণের অভীপ্সা, অন্তরের অভিব্যক্তি আর এই স্বপ্ন আত্মীকৃত হয়ে গেছে তাঁর স্বল্পায়ু জীবন ও স্বল্পতর সৃষ্টির মধ্যে। কিন্তু সে সবের প্রভাব বহুদূর বিসর্পী। গোকুল চন্দ্র নাগের সাহিত্য সৃষ্টির পৃথক কোন মূল্যায়ন সম্ভব নয় তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিমানসকে বাদ দিয়ে আর সে সবের জন্য সেকালের সকলে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। এঁদের মধ্যে কবি, লেখক, শিল্পী, সমালোচক, চলচ্চিত্র ও নাট্য জগতের লোক সকল স্তরের মানুষই রয়েছেন। তবে নজরুলের কবিতায় বোধ হয় পুরো গোকুল নাগকেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

বাণী তব—তব দান—সে তো সকলের,
ব্যথা সেথা নয় বন্ধু! যে ক্ষতি একের
সেথায় সান্ত্বনা কোথা? সেথা শান্তি নাই,
মোরা হারায়েছি;—বন্ধু, সখা, প্রিয়, ভাই!...
'পথিকে' দেখেছে তারা, দেখেনি 'গোকুলে',
ডুবেনিক'—সুখী তারা—আজো তারা কূলে।
আজো মোরা প্রাণাচ্ছন্ন। আমরা জানি না
গোকুল সে শিল্পী গল্পী কবি ছিল কিনা।
আত্মীয়ে স্মরিয়া কাঁদি, কাঁদি প্রিয় তরে,
গোকুলে পড়িছে মনে—তাই অশ্রু ঝরে।

বাংলা সাহিত্যসেবীদের কাছে বন্ধু সখা, প্রিয়, ভাই, একজনই ছিলেন, সে গোকুল নাগ, এটা তাঁর ব্যক্তি জীবনের পূর্ণ পরিচয়। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি—এই সে সম্বন্ধে নজরুল বলে গেছেন—

কথার ফানুস

ফাঁপাইয়া যারা যত করে বাহাদুরী,
তারা তত পাবে মালা যশের কস্তুরী।
'আজ' টাই সত্য নয়, ক'টা দিন তাহা ?
ইতিহাস আছে, আছে ভবিষ্যৎ যাহা
অনন্তকালের তরে রচে সিংহাসন,
সেখানে বসাবে তোমা বিশ্বজনগণ।

বাংলা সাহিত্যের পালা বদলে কল্লোল গোষ্ঠীর অবদান অনস্বীকার্য আর এই পালাবদলের প্রধানতম পুরোহিত অকালে ঝরে যাওয়া গোকুল নাগ।

মণীন্দ্রলাল বসু (১৮৯৭-১৯৮৪)

যে প্রত্যাশা একদিন বাঙালী পাঠকের মনে জাগিয়েছিলেন মণীন্দ্রলাল বসু, তা তিনি পূরণ করেন নি। এই অভিযোগ এবং কিছুটা অভিমান আমাদের থেকেই যাবে। ছাত্রাবস্থাতেই যাঁর গল্প পাঠকমনে অপার ঔৎসুক্য এবং সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল এবং পরিপূর্ণ তারুণ্যের প্রথম পূর্ণাবয়ব ফসল 'রমলা' উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে স্থায়িত্বের দাবি নিয়ে আবির্ভূত হল তিনি কেন যে একটা অকল্পনীয় সংযমে নিজেকে গুটিয়ে রাখলেন, পর্যাপ্ত বিকাশের চেষ্টা না করে সেটা বুঝে ওঠা দুষ্কর। রমলার পরে তিনি আরো কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন, লিখেছেন বেশ কিছু ছোট গল্প এবং বলতে দ্বিধা নেই সে সবের মধ্যেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাঁর বৈদগ্ধ্য-পরিশীলিত কবিকল্পনার অমিত শক্তি। কিন্তু তবু মনে হয় আরো অনেক দেবার ছিল। অন্ততঃ তিনি আজ 'রমলার লেখক' এই সীমিত পরিচিতিটুকু নিয়েই কীর্তিত হতেন না।

মণীন্দ্রলাল জন্মেছিলেন ১৮৯৭ সালে ২৪ পরগণার চাংড়ীপোতায়। তবে স্থায়ী নিবাস ছিল কলকাতার ঝামাপুকুরে। পিতা প্রবোধ চন্দ্র বসু ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট জজ। ১৯১৪ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে বিলেত যান এবং ১৯৩০ সাল থেকে কলকাতা হাইকোর্টে প্রাকটিশ শুরু করেন। রমলা ছাড়াও তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে জীবনায়ন, সহযাত্রিণী, মায়াপুরী, রক্তকমল, সোনার হরিণ, কল্পলতা ঋতুপর্ণা, অজয়কুমার প্রভৃতি।

কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রভাবে সেই সময়ের তরুণ তরুণীরা নব-নব জীবনধারায় নিজেদেরকে আলোড়িত করত, মণীন্দ্রলালের গল্প উপন্যাসে সাধারণত তাদেরই বারবার আসা-যাওয়া করতে দেখা যায়। আর্থিক দিক থেকে কিছুটা সচ্ছল, শিক্ষায় উচ্চ ডিগ্রীপ্রাপ্ত কিংবা উচ্চাভিলাষী, আচার আচরণে বেশ শৌখিন ও কেতাদুরস্ত অর্থাৎ নাগরিক জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত তাঁর নায়ক নায়িকারা। সাহিত্যের ইতিহাসে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "গল্প

উপন্যাসের নায়িকারা সুন্দরী শিক্ষিত এবং ধীর, ছেলেমানুষ ও অপাপবিদ্ধ। নায়কেরাও স্মার্ট, শহুরিয়া, ড্রয়িং রুম-বিলাসী, দার্জিলিং-পুরী-নিবাসী; কন্টিনেন্টাল উপন্যাস ও ফারসী কবিতা তাদের উপভোগের বস্তু; তাহারা পিয়ানোয় বীটোফেনের মুনলাইট সোনাটা অনর্গল বাজাইতে পারে। চমৎকার বাংলা কবিতা লিখিতে পারে। ছবি আঁকাও বেশ আসে। তাহারা অত্যন্ত ভাববিলাসী ও প্রণয়কাতর। মোট কথা তাহারা মূর্তিমান কলেজবয় রোমান্স। সুখপাঠ্য, বিভূতিভূষণের সংগে ভাবগত ঐক্য। দুজনেই সমান ভাবুক এবং অন্তর্মুখী। দুজনের পাত্রপাত্রী যেন একই জগতের জীব, তফাৎ এই মণীন্দ্র বাবুর পাত্রপাত্রী শহরবাসী, ধনী ও সংস্কৃতিমান, আর বিভূতিবাবুর হল পল্লীবাসী ও সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত। দুজনেই উদ্ভিদভক্ত। মণীন্দ্রবাবুর রচনায় সহরের ভিলায় সযত্নরোপিত মূল্যবান লতাগুল্ম, মৌসুমী ফুলের বাহার, আর বিভূতিবাবুর রচনায় পাড়াগাঁয়ের পল্লীপথের বাঁকে নাম-না-জানা গাছ আগাছার ভিড়।"

কিন্তু এই মূল্যায়নই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি সম্বন্ধে পরিপূর্ণ নয়। মণীন্দ্রলাল নিঃসন্দেহে রোমান্টিক কিন্তু কোন উন্নাসিকতা বা বাস্তবের অবহেলা এই প্রবণতার ভিত্তিভূমি নয়। হয়ত বাস্তব প্রেক্ষাপট বা বস্তুগত পরিপ্রেক্ষিত খুব বেশী করে তাঁর মনকে আলোড়িত করে নি কিন্তু তাই বলে সেকালের সমাজ ও জনগণ সম্বন্ধে তিনি অনবহিত ছিলেন একথা মনে করার কোন কারণ নেই। সমষ্টি ও ব্যষ্টিজীবনে যে ভাঙাগড়া, অবক্ষয়, নিত্য নতুন ভাবের আদান প্রদানে মানসিক ভারসাম্যহীনতা এ সব তার মনেও এসে ভিড় করেছে এবং তাঁর লেখার উপাদান যুগিয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজে যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও নৈতিক অধঃপতন ধীরে ধীরে শুরু হয়েছিল সে সকল তাঁর শিল্পীসত্তাকেও যথেষ্ট পরিমাণে ক্লিষ্ট ও পীড়িত করে তুলেছিল এবং স্বভাবসিদ্ধ রুচি ও সংযমে তিনি তা থেকে মুক্তি পেতে এবং দিতে চেয়েছেন, রূপ দিতে চেয়েছেন যুগের ধর্ম ও স্বভাবকে।

ফোর আর্টস্ ক্লাবের তিনি একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন দিনেশ দাশ, গোকুল নাগের মত ব্যক্তিরা। এই ক্লাবের ধারা বেয়েই বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল' মুখরিত হয়ে উঠেছিল। অবশ্য প্রকৃত কল্লোলপন্থীদের সংগে তাঁর একটা মানসিক দূরত্ব ও ব্যবধান বরাবরই ছিল। জীবনের

নতুন তাৎপর্য হৃদয়ংগমে, নবলব্ধ নীতির আলোকে নতুন যুগচেতনার ভাষ্য ব্যাখ্যানে যে অক্লান্ত অতন্দ্র সাধনায় নিবিষ্ট ছিলেন প্রারম্ভিক পর্যায়ের কল্লোল গোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যসেবীরা-মণীন্দ্রলাল সে পথের পথিক হন নি। শুধু দূরে থেকে অবলোকন করে, অনুভব করে, সামান্য ইঙ্গিত দিয়েই যেন নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন; এর গভীরে প্রবেশ করে কুশ্রী কুটিল কোন আবর্তের সৃষ্টি করতে, বিতর্কের বাতাবর্ত সূচনা করতে তাঁর সৌন্দর্য পিয়াসী রোমান্টিক মন অনীহ ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত পৃথিবীতে যে অস্থিরতা, প্রত্যয়হীনতা ও সর্বগ্রাসী অপচিতি সকল ধ্যান ধারণা ও মূল্যবোধের উৎসাদন করতে লাগল তখন সবচেয়ে বিচলিত ও উদ্বেলিত হল শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা। সমাজের উচ্চ কিংবা নিম্ন-শ্রেণীর মানসিক ভারসাম্য অতি সহজে দোলায়িত হয় না। ভাল বা মন্দ, নিজেদের জীবনধারার সমিল বা অমিল, যাই আসুক না, নিজেদের অবস্থানের কেন্দ্রবিন্দু থেকে তারা সহজে বিচ্যুত হয় না। কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমস্যা বহুবিধ। অর্থনৈতিক অবনমনের সংগে শিক্ষা ও রুচির একটা সামঞ্জস্য বজায় রাখতে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করতে করতে ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং অতি গোপন রন্ধ্রপথ দিয়ে যে সব পাপাচার ও ভ্রষ্টতায় তারা কবলিত হয় সে সবের প্রকাশিত প্রত্যক্ষ রূপ দেখে শিহরিত হয় বটে কিন্তু সজ্ঞানে অস্বীকার করার উপায় তাদের থাকে না। মন ও মননের নিরন্তর টানাপোড়েনে একদিকে থাকে ব্যক্তিমানসের মুক্তির প্রয়াস আর অন্যদিকে লক্ষিত হয় পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি দায়িত্ব চেতনা। নানাবিধ বাত্যাপীড়িত চিন্তাতরংগের ঘাত অভিঘাতের নির্মম কুটিল যে মনোবিভংগ তারই কুণ্ঠাহীন বে-আব্রু চিত্রণের এক দুর্মর প্রয়াস ছিল কল্লোলীয় সাহিত্যিকদের। এই মধ্যবিত্তদের যন্ত্রণা ও মুক্তি প্রয়াসের বহু স্বাক্ষর রয়েছে মণীন্দ্রলালের রচনায়। তাই সে দিক থেকে তিনি এঁদের পূর্বসূরী এবং কিছু পরিমাণে সহমর্মী বলা যায়।

নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তর উপন্যাস ও গল্প, বিশেষ করে তাঁর যৌন বিষয় বর্ণনা-মূলক রচনাংশ বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল সেই সময়ের নবীন সাহিত্য প্রয়াসীদের, কিন্তু সেই রচনার অলজ্জ ও অশংক প্রকাশ ভংগিমার প্রতিই তাঁদের আকর্ষণ ছিল বেশী। যুগের অন্তর্লীন বেদনা ও ভাবনা তাঁদের লেখায় বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে ফুটে ওঠেনি। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লেখায় মণীন্দ্রলাল যে সম-

কালীন ব্যথা ও হতাশার চিত্র তুলে ধরেছেন তা যেমন একদিকে উত্তরসূরীদের চিন্তাকে 'উজ্জীবিত করেছিল, তেমনি তাঁর উচ্ছাসময় কাব্যসুষমামণ্ডিত ভাষা ও প্রকাশরীতি অনেকেরই অনুকরণীয় হয়ে উঠেছিল।

প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'মা' গল্প যেটি পরে মায়াপুরী গল্প সংগ্রহে সংকলিত। মায়াপুরীর নিবেদনে লেখক বলেছেন, 'হৃদয় দিয়েই সাহিত্যের কারবার। আমার এ গল্পগুলো যদি কারও হৃদয় স্পর্শ করতে পারে, যদি কোন করুণ ক্লান্ত ক্ষণে, কোন অলস মধুর অবসরে এ লেখা কারো অন্তরে একটু আনন্দ দিতে পারে তবে আপনাকে কৃতার্থ মনে করব'। এই গ্রন্থের বেশীর ভাগ গল্পই অলস মধুর অবসরে পঠিতব্য, কিন্তু 'মা', 'সুকান্ত', 'মুকুল' এমন কয়েকটি গল্পে সেকালের সার্বিক অবক্ষয়ের চিত্রই তুলে ধরেছেন লেখক। তাই এসব গল্প আমাদের নিশ্চয়ই আনন্দ দেয়। তবে তা কারুণ্য মেশা, অশ্রুবিদারী, বিয়োগান্তক কাহিনী পাঠের পর গ্লানিমুক্ত হৃদয়ের আনন্দ।

'মা' গল্পে এই কারুণ্য ও বেদনা যেন জমাট বাঁধা। গরীব ঘরের মেয়ে বিভা, আরো গরীব স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। স্বামী দূরে চা বাগানের সামান্য বেতন ভোগী কর্মী খাওয়া দাওয়ার কষ্ট নিত্যদিনের। স্বামী থাকে বিদেশে। দারিদ্র্যজর্জর সংসারে শাশুড়িকে নিয়ে একটি স্যাঁতসেঁতে ঘরে থাকতে হয়। পর পর দুটি পুত্রসন্তান নষ্ট হবার পর একটি জীবন্ত মেয়ে জন্মাল। তখন বিভার প্রাণে এল নতুন জোয়ার। অভাব অনটন সত্ত্বেও মহা আনন্দেই তার দিন কাটতে থাকে, বাঁচার স্বাদ যেন নতুন করেই সে পেল। এই মেয়েকে ঘিরে তার অনেক স্বপ্ন, অনেক সাধ। কিন্তু কিছুদিন যেতেই মেয়ের যে ব্যাধি দেখা দিল তা দুরোরোগ্য। সাধ্যমত চিকিৎসা করায় সে পাশের বাড়ীর ডাক্তারকে দিয়ে। ডাক্তারের স্ত্রী তার সখী, তাই চিকিৎসাবাবদ ফি নেয় না কিন্তু ওষুধের দাম তো লাগে। শাশুড়ির ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে অনেক কষ্ট করে ওষুধ পথ্য জোগাড় করে কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। 'এক রাত খুকী কি কান্নাই কাঁদিল; মাতৃহীন অন্ধ পক্ষীশাবকের মত করুণ সুরে সমস্ত বাড়ী আকুল করিয়া রহিয়া রহিয়া বারবার সারারাত ধরিয়া কাঁদিল; পাশের বাড়ীর ডাক্তারবাবুর ঘুম কতবার ভাঙিয়া গেল। আর সেই কান্নার সঙ্গে ফোঁস ফোঁস শব্দ। বারবার নাক বুজিয়া যাইতেছে, এই বুঝি নিশ্বাস প্রশ্বাস

আটকাইয়া যায়।' এবং রাত্রিশেষে সত্যিই আটকাইয়া গেল। বাঁচান গেল না। ছোঁয়াচে রোগ, তাই ডাক্তারবাবু নির্দেশ দেন সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে। বিছানাপত্র সব পোড়ান হল কিন্তু বিভা খুকীর একটি জামা ও একজোড়া মোজা লুকিয়ে রাখল। সবার অলক্ষ্যে সে সেই জামা ও মোজাকে আদর করে। চুমো খায়।

ডাক্তার বাবুর ছোটছেলেকে সে কোলে নেবার জন্য একদিন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে পেল ডাক্তারবাবু তাঁর স্ত্রীকে বলছেন, 'ওসব ভগবানের নিয়ম। বাপ করে পাপ আর ছেলে মেয়েরা অমন ভুগে মরে।'— 'বিভা আর শুনিতে পারিল না। তাহার দুই কানে কে আগুনে গলা সীসা ঢালিয়া দিয়াছে। সমস্ত মাথা জ্বলিয়া যাইতেছে। কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ীর বাহির হইয়া নিজের ঘরে গিয়া মেঝেতে লুটাইয়া পড়িল।' বছর দেড়েক পরে স্বামী কর্মস্থল থেকে বাড়ী এসে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হল। সে বুঝতে পারে তার সব ব্যাভিচারের খবর বিভার কাছে স্পষ্ট কারণ বিভার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে ক্ষোভ ও ঘৃণা। কিন্তু বেশীদিন এভাবে কাটে না, প্রকৃতির নিয়মে পেটে আবার সন্তান আসে। স্বামী কর্মস্থলে ফিরে যায়। বিভা রোজ 'তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়া প্রণাম করিয়া বলে, ঠাকুর এবার যেন আমার একটি মরা ছেলে হয়।' এক বিরাট শূন্যতা আর নির্বাক আর্তনাদে আমরাও আচ্ছন্ন হয়ে যাই। এই গল্পটি সম্বন্ধে সাহিত্য-সমালোচক ভূদেব চৌধুরীর মন্তব্য, "গল্পের সমাপ্তি মৃত মানুষের আর্ত কঙ্কালের দেহ ঘিরে প্রবৃত্তি-পশুর এক আদিম ক্রীড়ারূপকে যেন আশ্চর্য এপিক গাঢ়তায় অনবদ্য এক ট্রাজেডির আকারে কালো পাথরের মত জমাট করে তুলেছে। অথচ শিল্পীর ভাষা-ভঙ্গী আদ্যন্ত রোমান্স-লিরিকের মায়া-সুরভিত; এ গাঢ়তা শিল্পীপ্রাণের—নিজের রুচিস্নাত আত্মাটিকে যেন মধ্যবিত্ত অবক্ষয়ের ট্রাজিক রূপ দিয়েছেন তিনি।

তবে এই ধরনের রুক্ষম, শীর্ণ, কঙ্কালসার বর্ণনা তিনি খুব একটা করেননি, তাঁর রুচিস্নাত মন এবং রোমান্টিক অভীপ্সাই এ সবের প্রতিকূল ছিল। এক স্বপ্নমেদুর আশায় উজ্জ্বল জীবনের প্রতিচ্ছবিই তিনি আঁকতে চেয়েছেন সহজ বিলাসে, অনাবিল কাব্য সুষমায়, যেমন মধ্যবিত্ত হতাশা দিয়ে তাঁর 'সুকান্ত' গল্পটি শুরু হলেও মধু নিষ্যন্দী এক কল্যাণী পরশে এর পরিসমাপ্তি।

নায়ক সুকান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। রসায়নের গবেষণায় আত্মোৎসর্গ

করে দেশ ও জাতির সেবা করবে এই স্বপ্ন ছিল তার। দেশ ও বিদেশে খ্যাতিও পেয়েছে কিছুটা, কিন্তু ভাগ্য এমনই বিরূপ যে উত্তরাধিকার সূত্রে পেল দুরারোগ্য ক্ষয়রোগ মায়ের কাছ থেকে। জীবনের শেষ কয়টা দিন একটু শান্তি আরামের জন্য বৈদ্যনাথধামে গিয়েছিল। এখানে সে বিগত জীবনের নানা কথা চিন্তাতে ভরিয়ে রাখত নিজেকে আসন্ন মৃত্যুর চিন্তা থেকে রেহাই পেতে। বাল্যবন্ধু সতীশ ও তার বোন উষা কয়েকটা দিন কাটিয়ে গেল। সতীশের অনুরোধে উষা গান গেয়ে শোনাত সুকান্তকে। মৃত্যুপথযাত্রী যেন নূতন করে বাঁচার স্বাদ পেল। দেহে মনে এল স্বাস্থ্যের জোয়ার। কিন্তু তা ক্ষণিকের, আবার সেই রোগ সর্বদেহ অবশ করে দিল, ধীরে ধীরে মৃত্যুকবলিত হল সে। কিন্তু শেষের কটা দিন উষার ভালবাসা, তার লালিত্য ও মধুরিমা সকল জ্বালা ও অবসাদকে কিছুটা প্রশমিত করতে পেরেছিল। পরম প্রশান্তিতে ভরে উঠেছিল শেষের দিনগুলি। 'হঠাৎ এসেছিল চলেও গেল হঠাৎ, মনে রেখে গেল দাগ।' এই মধুভরা দাগ বুকে নিয়েই সে যেন সব হতাশা কাটিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। সে হতাশা ও গ্লানি আমরা গল্পের আরম্ভে প্রত্যক্ষ করি, তা পরিসমাপ্ত এক রোমান্টিক স্বপ্নচারিতা ও তন্দ্রালসতায়।

মুকুল গল্পটিও অনেকটা এই ধরনের। একটা করুণ সুরে গল্প শুরু হলেও শেষে কোমল মধুর স্বপ্নালুতাই প্রাধান্য পেয়েছে। ছোট নাতি মিনুকে নিয়ে দাদু পুজোর বাজার করতে আসে। কাপড়ের দোকানে অনেক বাছাইএর পর মিনুর একটা শাড়িও পছন্দ করে কিন্তু দাম দিতে গিয়ে দেখা গেল সব টাকাই পকেটমার হয়ে গেছে। মিনুর চোখে জল এসে যায় কিন্তু দাদুর শোকাতুর বিধ্বস্ত চেহারা দেখে নিজেকে সামলে নিয়ে দাদুকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বাড়ী ফিরে এল। সেই টাকা যে চুরি করেছে তার নাম রহিম, সদ্য জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। টাকা নিয়ে গোপনে পালিয়ে যাবার সময় ধরা পড়ে একজন বলিষ্ঠ যুবকের কাছে। অনেক গালমন্দ, মারের ভয় ইত্যাদির পর রহিম টাকা বের করে দেয় এবং সেই যুবকটিকে নিয়ে মিনুদের বাড়ী আসে টাকা ফেরৎ দিতে। কিন্তু গলির মধ্যে বাড়ীর বাইরে এসে সেই যুবক যা দেখে আর শোনে তাতে বিস্মিত না হয়ে পারে না।

যুবকের নাম মুকুল কিন্তু সে শুনতে পেল তারই নাম ধরে নারীকণ্ঠে কে ডাকছে, একটি ছোট শিশুকে। সেই নারী আর কেউ নয়, একসময় তাদের বাড়ীতে

নিত্য আসা যাওয়া করা রেণুকা। রেণুকা ভালবাসত মুকুলকে, সেই ভালবাসা বিয়েতে সার্থক হয়ে ওঠেনি। বিয়ে হল অন্য জায়গায় কিন্তু ভালবাসার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে ছেলের নাম রেখেছে মুকুল।

গল্পের শেষ ও শুরুতে বিস্তর ব্যবধান। মধ্যবিত্ত জীবনের অর্থনৈতিকসংকট, সামাজিক দায়-দায়িত্ব এবং আশা-নিরাশা এসবই অতি সুন্দর ভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছিল। বয়স্ক রহিমের চৌর্য ও স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়েও বাস্তব, সামাজিক অবস্থার আঁচ পাওয়া যায় কিন্তু সবই যেন শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গেল কল্পলোকের ছোঁয়ায়, বিলাসী ভাবাবেগের আবর্তে।

'বেনামী', 'সুধা' প্রভৃতি গল্পে বাস্তব অবাস্তব দুটো ছোঁয়াই লেগেছে। প্রেক্ষাপট অতি বাস্তব কিন্তু রূপায়ণ বা বর্ণনাভঙ্গী কিছুটা আদর্শায়িত, লেখকের নিজস্বতা দ্বারা প্রলেপিত, সব সময়ে বাস্তবের চাহিদা মেটায়নি। বন্ধুকে অন্য নামে লুকিয়ে সাহায্য করা এবং সেই সাহায্যপ্রাপ্ত বন্ধুর বিরাট বড়লোক হয়ে যাওয়ার মধ্যে লেখকের সদিচ্ছাই যেন আরোপিও, গল্পের বস্তুভূমির সুসমঞ্জস নয়।

সুধাতেও ধনপতি স্যাকরা লক্ষ টাকার মালিক, কৃপণ বলে পাড়ায় বিশেষ অখ্যাতি। কোন কুলে কেউ নেই, শুধু একটি নাতি এবং সেই নাতিটিও কিছু দিন পরে সব মায়া ত্যাগ করে চলে গেল পরপারে। বিশাল সম্পত্তির মধ্যে ডুবে থাকা ধনপতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর ভাবে বৃথাই এ উপার্জন, এই সঞ্চয়। পাড়ার অনাথা মেয়ে সুধা একদিন পোষা বিড়ালের খোঁজে ধনপতির বাড়ীতে চলে আসে, ধনপতিকে দেখে অভিযোগ করে কেন সে বিড়ালকে পিটিয়েছে। ধনপতি জবাব না দিয়ে অপলক চোখে চেয়ে থাকে তার দিকে আর ভাবে নিজের নাতির কথা। এর পরে ধীরে ধীরে সেই মেয়েটিকে ধনপতি আপন করে নেয় আর সেও বৃদ্ধ ধনপতির স্নেহের ডোরে বাঁধা পড়ে। লেখকের বর্ণনায় ঘটনা এবং চরিত্র অতি সজীব ও প্রাণময় হয়েছে এবং সমকালকে ছাপিয়ে সর্বকালিক একটা আবেদন রয়েছে স্নেহের বুভুক্ষা ও মাধুরী চিত্রণে।

মণীন্দ্রলালের গল্পগুলির মধ্যে আমরা একটা প্রত্যয়নিষ্ঠা ও আদর্শায়িত আস্থাবোধের সন্ধান পাই। শারীর রহস্য নিয়ে তিনি ব্যাপৃত থাকেন নি, সেই শরীরকে ঘিরে মনের যে অহরহ লীলাপ্রবাহ তা নিয়েও খুব একটা ঔৎসুক্য দেখান নি। মানসিক চিন্তা ও ভাবনা যে উৎস থেকে সৃষ্ট সেই সব গ্রন্থি উন্মোচন

করেছেন, তাও কতকটা নিরাসক্ত নিস্পৃহভাবে। নারীর চপলা মোহিনী মূর্তি কর্বাচিৎ কখনো তাঁর লেখায় আবিভূর্তা হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখতে পাই কল্যাণী মঙ্গলময়ী রূপ। কয়েকটি ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নারী চরিত্র-গুলির সঙ্গে মনীন্দ্রলালের নায়িকাদের এক দূরকল্পিত সারূপ্য ও সাধর্ম্য লক্ষ্য করা যায় বটে, কিন্তু শরৎচন্দ্র যেখানে সমাজের ক্লেদাক্ত পরিবেশ থেকে নারী-আত্মার মুক্তি সাধনে সচেষ্ট, মণীন্দ্রলাল সেখানে সমাজ-অনিভর্র ব্যক্তি মানসের মুক্তি-প্রয়াসী।

বরং বিভূতিভূষণের সঙ্গে তাঁর মানসিক নৈকট্য অনেক বেশী, বিশেষ করে প্রকৃতিপ্রিয়তা ও কল্পনাপ্রবণতার ক্ষেত্রে। গাছপালা লতা দুজনেই ভাল-বাসেন। দুজনেই উদ্ভিদ বর্ণনায় তন্ময় হয়ে যান। যেহেতু বিভূতিভূষণ পল্লীবাংলার চিত্রী, তাই বনকচু, ধুতুরা, কুঁচকাটা, ঝুমকোলতাই ভিড় জমিয়েছে তাঁর রচনায়, ছড়িয়ে দিয়েছে শ্যামল শোভা আর সোঁদা গন্ধ। কিন্তু মণীন্দ্রলাল যে গাছ গাছালির বর্ণনা করেছেন তা সহরের চারপাশে, বাড়ীর টবে ছাদের উপরেই শোভা পায়। বিগোনিয়া, ফিউসিয়া, পিটুনিয়ার বাহার তাঁর লেখার মধ্যে, সুন্দর কিন্তু বিদেশী। তবে একথা বলা চলে দুজনেই সৌন্দর্যের ভক্ত, তার আড়ালে কি কুৎসিত ও বীভৎস রূপ বিরাজ করছে তা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা ছিল না এঁদের।

মণীন্দ্রলালের কোন কোন গল্প বস্তুভূমক হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাধান্য পেয়েছে রোমান্টিক ভাবাবেগ, খেয়ালী কল্পনা। কল্পরাজ্যের সীমাহীন মায়া-মোহতায় যেন মানসিক মুক্তি খুঁজে পেতেন। পল্লীর সঙ্গে সুনিবিড় প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ না থাকার ফলে গ্রামের জীবন তাঁর লেখায় বিশেষ পাওয়া যায় না। অথবা যেটুকু ছিল তা অনেকটা দূর থেকে দেখা জ্ঞাননেত্রের মাধ্যমে, ফলে বাংলার সুদূর গ্রামাঞ্চলের মানুষজন, তাদের জীবনধারণ বস্তুনিষ্ঠ হয়ে ফুটে ওঠেনি। দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের অতিরিক্ত অধ্যয়ন ও রসাস্বাদন তাঁকে শীর্ণ পঙ্কিল কঠিন বাস্তব থেকে অনেকখানি দূরে সরিয়ে রেখেছিল, তাই সমকালীন নৈরাশ্য, যন্ত্রণা তাঁর গল্পে উঁকি দিয়েই চলে গেছে, সুস্থায়ী কোন শিকড় গাড়তে পারেনি। বুদ্ধি ও মননে যে কুশ্রী রূপ দেখেছেন হৃদয়ে তা অনুভব করতে চাননি, ফলে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত ভেসে চলেছেন এই সব অবস্থাকে পাশ কাটিয়ে।

'অরুণ', জন্ম-জন্মান্তর', প্রভৃতি গল্পে তিনি এই কল্পনাপ্রিয়তার চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারিতা ঘটিয়েছেন। অরুণের মনের বাসনা, "যারা ভাঙতে চায় আমি তাদের দলের। আমি যদি খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতে জন্মাতুম, তবে বুদ্ধের শিষ্য হতুম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম ভাঙতুম; আমি যদি খৃষ্টের সময়ে প্যালেস্টাইনে জন্মাতুম, তবে খৃষ্টের শিষ্য হতুম, রোম রাজ্য ভেঙে ধর্মরাজ্য স্থাপনে লাগতুম; আমি যদি মিল্টনের সময় ইংলন্ডে জন্মাতুম, ক্রমওয়েলের সেনাদলে ভর্তি হোতুম; আমি যদি অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাঞ্জাবে জন্মাতুম গুরু গোবিন্দের শিষ্য হতুম; যদি ফ্রান্সে জন্মাতুম, রেভোলিউশনের রক্তগঙ্গায় তর্পণ করতুম—সেই ভাঙার গান আমার রক্তে বাজছে তাই বলশেভিক হলুম।" অর্থাৎ সেই সময়ের যুবকদের মনে একটা প্রতিবাদী সত্তা, ঐতিহ্য ও সংস্কার বিরোধী মনোভাব অতি সক্রিয় ছিল, মনের গোচর এবং অগোচরে নূতন কিছু করার তাগিদ অনুভব করত, অরুণের মনেও সেই দোলা লেগেছে। কিন্তু এ দোলা পর্যন্তই, স্থির ভাবনা ও দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে কখনো গ্রন্থিবন্ধ হয়নি।

এই উদ্দাম ভাবনার সঙ্গেই মিশে থাকে প্রণয়কাতরতা। কিন্তু সেখানেও শিভাল্‌রি এসে ভিড় করে।

"বীণা শান্ত হয়ে বসে আমায় সব কথা বললে—বললে আমাকে তার চাই। এক তরুণী তার যৌবন জাগ্রত বিকচোন্মুখ দেহপদ্মকে আমার বুকে সঁপতে চায়, আমি তা প্রত্যাখ্যান করলুম। আমার কথা শুনে সে এক-শ্যাওলা ঘেরা পাথরে বসে পড়ল।" পরক্ষণেই সৌন্দর্য পিয়াসী মণীন্দ্রলাল ডুবে যান রূপ বর্ণনায়, প্রকৃতির শোভার সঙ্গে মনের সাধনে।

চৈত্র সন্ধ্যার হাওয়ায় মাথার উপর শাল গাছের পাতা সরে গেল, ছিন্ন মেঘ থেকে ঝরা জ্যোৎস্নার আলো চোখে ঝরল—ঝর্ণা-বুকে তারার দীপ্তির মত। সেই নিমেষের জন্য বীণাকে অপরূপ রূপে দেখলুম—বোধ হল জগতে এমন শ্রী আর নেই। দেখলুম চোখ দুটি উল্কার আলোর মত, পিপাসায় ভরা, দেখলুম তার মুখখানি প্রেমারতির প্রদীপ, দেখলুম তার কন্ঠে ও বক্ষে অনল-দীপ্তি, নীলাম্বরী শাড়ি সেখান হতে খসে পড়েছে; আমি শুনলুম তার রক্তধারায় কিসের কান্না, তার চিত্তভরা বিরহ বেদনা তরুণী তনুর উপর যেন কৈশোর যৌবনের স্পন্দন লেগেছে—আঁখিতে কি যাদু মন্ত্র, কন্ঠে কি সুধাধারা, আঙ্গুলে কি মাদক স্পর্শ, চরণে মোহন গতি, তনুভরা মোহন আহ্বান। আমি বিস্মিত হলুম, মোহিত

হলুম, ভীত হলুম। যেমন শুকতারার আলো, সঙ্গীতের স্বরধ্বনি, সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে বর্ণের উচ্ছ্বাস, যেমন মাধবী রাত্রি, সাগরে জ্যোৎস্না, সেই রকমই তো বীণা—বিশ্বের রূপলোকে তাকে দেখলুম—এই তো আমার সত্যিকার দেখা।

'জন্ম জন্মান্তর' গল্পেও এক খেয়ালী কল্পনা। উদ্দাম বাসনা, অবাস্তব ঘটনাপুঞ্জের সমাবেশ। যেটুকু বিশ্বাস্য বস্তু শুরুতেই ছিল তা একটু পরেই মিলিয়ে গেল কল্পনার বল্গাহীন প্রবাহে, হৃদয়ের ভাবপ্রবণতায়। একবার এই রাশকে শ্লথ অর্গলমুক্ত করে দিয়েই লেখক নিশ্চিন্ত। রয়েছে কল্পনার অবাধ গতি, ভাষাব উপর আশ্চর্য দখল, কাব্যময় বর্ণনার অসাধারণ ক্ষমতা, উপমা-প্রয়োগের বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল।

এই গল্পেও সমকালের প্রবণতার একটা সাংকেতিক রূপ দেবার চেষ্টা আছে, দেহকে উপলক্ষ করে দেহের নিভৃতের সন্ধান। বেলা ও তরুণ পরস্পরকে ভালবাসে। তরুণ থাকে মেসে আর বেলা মেয়ে বোর্ডিংএ। দুজনের মধ্যে ভাব ভালবাসার কোন ঘাটতি নেই তবু তরুণ অতৃপ্ত। সে তাই বিশ্বপরিক্রমায় বেরিয়ে পড়ে প্রিয়ার সন্ধানে। কিন্তু "কোথা সে প্রিয়া ? কার জন্য এ অভিসার ? এ সন্ধান যেন কোন রক্তমাংসের নারীর জন্য নয়—এ কোন অজানা অলকাবাসিনী অনন্ত যৌবনা চির সৌন্দর্যময়ীর জন্য। কোথায় সে অলকা ? সে কি আমারই চিত্তের মর্মস্থলে আমারই অন্তর কমলের স্বর্ণপাপড়ির শয্যায় সুপ্ত আছে ? অথবা সে সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে আপনাকে মিলিয়ে মিশিয়ে ছড়িয়ে লুকিয়ে জল স্থল আকাশে আপনাকে মুক্ত বিকম্পিত শিহরিত চঞ্চল করে, ক্ষণে ক্ষণে কোন অজানা মুহূর্তে দেহমন স্পর্শে উন্মনা করে যায়—তৃষিত ব্যথিত দীপ্ত আনন্দিত করে ?"

তারপর সেই সন্ধানে বহু দূরান্ত পরিভ্রমণ। পারস্যের নর্তকী সেলিমার দেখা পায় সূর্যের আলোভরা অলস মধুর মধ্যাহ্নে দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে এক গিরিশিখরে। 'মরুভূমির অগ্নি দীপ্তির সহিত ওয়েসিসের স্নিগ্ধতা মেশানো মাদিলার' দেখা পেল বেদুইনের দলে। সেখান থেকে রুশ তরুণী অল্গা—হোমানল শিখার মত শুভ্র পবিত্র মুখ। ভিয়েনা, ভেনিস, প্যারিস—সর্বত্রই তার আকুল অন্বেষণ। ইয়োরোপ থেকে চলে গেল আফ্রিকার হিংস্র নগ্ন বর্বর জীবনের ডাকে। চীন জাপান সব ঘুরে দীর্ঘ একুশ বছর পরে অতৃপ্ত হৃদয়ে আবার দেশে ফেরা। দেশে

ফেরার সময় জাহাজে স্বপ্ন দেখল, রূপকথার অনেক দুঃখ রাত্রির অবসানে তার প্রেমিকা যেন তাকে বলল, "যে পদ্মের জন্য তুমি জগৎ ঘুরে বেড়ালে সে পদ্ম দেখ ফুটে রয়েছে তোমারই বুকে। রাজপুত্র চেয়ে দেখল, সেখানে পদ্মের মত সুন্দরী রাজকন্যা সাগরের মত নীল শাড়ির উপর গোলাপের মত রাঙা ওড়না জড়িয়ে চাঁপার কলির মতন মোহন আঙুলে সোনার সুতার মত সেতারের তারগুলিতে ঝংকার তুলছেন। হাতে পান্নার চুড়ি, নীলার আংটি ঝিক্‌মিক্ করছে।"

দেশে ফেরার পর বেলা তাকে বলে, তাদের এই প্রেম এক জন্মের নয়, জন্ম জন্মান্তরের। কখনো তারা ছিল বাংলার গঙ্গাতীরের কৃষক-কৃষাণী, কখনো উজ্জয়িনীর অভিসারিকা আর বৌদ্ধ ভিক্ষু, কখনো বা বৃন্দাবনের প্রেমিক প্রেমিকা। তরুণের অভিসার অবশেষে সার্থক হয় বেলার অবিচল প্রেমালোকে।

মণীন্দ্রলাল বসু কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন যার মধ্যে একমাত্র 'রমলাই' লেখকের সাহিত্যিক উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে। জীবনায়ন, সহযাত্রিনী প্রভৃতি না লিখলেই বোধ হয় নিজের উপর সুবিচার করতেন। "কিন্তু 'রমলা' উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস ক্ষেত্রে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মী উপন্যাসের সহিত ইহা সম প্রকৃতির, ইহাতে কাব্যগুণের বিস্ময়কর আতিশয্য নাই, উদ্বৃত্ত সৌন্দর্যবোধের বিভ্রান্তকারী দীপ্তি নাই, আছে উহার স্থির কেন্দ্রনিষ্ঠ প্রয়োগ। সৌন্দর্য-প্রবাহ তটভূমি বন্ধনের মধ্যে দৃঢ় বিধৃত, বিশেষ কোথাও সীমা ছাড়াইয়া উদ্বেল হয় নাই। চিত্রপটের স্বল্পায়তন পরিধি সু-অঙ্কিত, কয়েকটি চরিত্রের সৌন্দর্য স্রোতে আত্মসমর্পণ করে নাই, কুশল মনস্তত্ত্ব নির্দেশেও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।···উপন্যাসখানি পড়িতে পড়িতে মনে হয় ইহা যেন রবীন্দ্র কাব্যেরই ঘটনা শৃংখল গ্রথিত ও মনস্তত্ত্বসম্মত আখ্যানরূপ। এই রোমান্টিকতা যেমন বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনায় ও ভাব-সংকেতের দ্যোতনায়, তেমনি প্রেমের বিচিত্র লীলা স্বপ্নের দল-উন্মোচনে আর সঙ্গে সঙ্গে প্রেমাবিষ্ট মনোলোকের চির চঞ্চল রহস্যব্যাকুলতায়। আখ্যানটিও এক বিষণ্ণ করুণ জীবন বোধের সুরসঙ্গীতিতে স্বপ্নমন্থর।"

উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে এই উপন্যাস সম্পর্কে, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে মূল্যায়ন, তা এর সার্থকতা ও গুরুত্ব নির্দেশের পক্ষে যথেষ্ট। 'রমলা' প্রকাশের কিছুকালের মধ্যেই শিক্ষিত তরুণ তরুণীদের কাছে এটি খুবই আকর্ষণীয় হয়ে

উঠেছিল মূলতঃ এর কাব্যিক বিন্যাস, ভাষার লালিত্য এবং সর্বোপরি রোমান্টিক শিল্পীসত্তার জয় ঘোষণায়। বাস্তব অবাস্তবের মিশ্রণে, ব্যবহারিক জগৎ ও কল্পনার রাজ্য দুটোরই আঘাত-সংঘর্ষে, আদর্শবাদ, ও বস্তুতন্ত্রবাদের টানা-পোড়েনে শেষ পর্যন্ত আদর্শ ও কবিত্বেরই আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতার জন্য এবং সমগ্র উপন্যাসটি জুড়ে যে কল্যানময় অন্তঃসলিলা একটা আধ্যাত্মিক অনুলেপন রয়েছে, সব মিলিয়েই 'রমলা' অনন্য। রজত এই উপন্যাসের নায়ক। সে শিল্পী, ছবি আঁকে, স্বপ্নভরা দুটি চোখে এই পৃথিবীর অনন্ত রহস্য খুঁজে বেড়ায়। সংসারে সে যেমন অনভিজ্ঞ তেমনি প্রেমের বিচিত্র ধারা সম্বন্ধেও অজ্ঞ। নায়িকা রমলা সতত চঞ্চল, উচ্ছল এক তরুণী, সুন্দরী শিক্ষিতা। আর রয়েছে মাধবী, অসুস্থ পিতার সব দায় দায়িত্ব তথা গোটা পরিবারের দায়িত্বই যেন সে বহন করে চলেছে। রয়েছে যতীন, ইঞ্জিনীয়ার, যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই সে জানে না। Science, Civilisatian and happiness এই তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। মাধবীর পিতা যোগেশবাবু অহরহ বিগত জীবনের স্মৃতি রোমন্থনে নিমজ্জিত, রমলাকে কন্যার মতই ভালবাসে। বৃদ্ধ কাজী সাহেব আসেন তার অবসরের ক্ষণগুলিকে কথা ও গল্পে ভরিয়ে দিতে।

যোগেশবাবু কন্যা মাধবী আর কন্যাধিক রমলাকে নিয়ে হাজারীবাগেই স্থায়ী ভাবে বাস করেন। কাব্যচর্চা, সংগীতচর্চা শিল্পচর্চার মধ্য দিয়েই এই সুখী লোকজনদের দিন কেটে যায়। রজত আসে একটি পোর্টেট করবে বলে। হাজারী-বাগের প্রাকৃতিক রূপ, নির্জনতা, দিগন্তবিস্তারী শ্যামলিমা তার চোখে নিয়ে আসে স্বপ্নবিভোরতা। রমলার কলহাস্যে আর মাধবীর মৃদু সস্মিত রূপ তাকে আরো আকৃষ্ট করে এই নতুন পরিবেশে। অনিবার্যভাবেই প্রেম সঞ্চারিত হয় রজতের মনে ঃ রমলা, মাধবীও বাদ যায় না। কিন্তু রমলা যেখানে সোচ্চার মুখর, মাধবী সলজ্জ বিনম্র। যোগেশবাবু রজতের সঙ্গে রমলার বিয়ে ঠিক করে ফেলেন উভয়ের সম্মতি নিয়েই।

এ সময় সেখানে যতীনের আবির্ভাব পরিস্থিতিকে কিছুটা জটিল করে তোলে। মিথ্যে সন্দেহ করে অভিমান করে রজত চলে আসে হাজারিবাগ ছেড়ে। পরে তাদের বিয়ে হয় এবং নানা ঘটনার আবর্তের মধ্য দিয়ে মাধবীকে বিয়ে করে যতীন।

এবার কলকাতায় নতুন পরিবেশে শুরু হয় রজত ও রমলার জীবনযাত্রা।

অবশ্য এর আগে পুরীতে তারা মধুচন্দ্রিমা সাঙ্গ করে। এতদিন যা ছিল নেহাৎই স্বপ্নকুহেলীমাখা মনের একটা অবসর বিনোদন, তাই বাস্তবের কঠিন স্পর্শলাভ করে, ছিন্ন হয়ে যায় সব স্বপ্ন, আশা, সাধ। দুই বেলা আহারের সংস্থানের জন্যই তখন দিনাতিপাত করে রজত, ভেসে যায় ছবি আঁকা, সৌন্দর্যের সাধনা করা। যথাকালে তাদের সন্তানও হয় কিন্তু দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে জীবনের সব রূপ মাধুরী যেন অবলুপ্ত।

যতীনও ব্যবসায়ে বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মাধবীর সঙ্গে নতুনভাবে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে। উভয়ের মধ্যে যেটুকু ভুল বোঝাবুঝি ছিল তা দূর হয়ে যায় অভাবের তাড়নায়। এই অভাব রজত ও রমলার সম্পর্ককে করে তোলে ক্লিস্ট শীর্ণ আর যতীন ও মাধবীকে নিয়ে আসে পরস্পরের কাছা-কাছি। যে যন্ত্রের দাসত্বের জন্য যতীন সংসারের যাবতীয় কোমল মধুর বস্তুকে অবহেলা করতে শুরু করেছিল আজ রিক্ত নিঃস্ব অবস্থার মধ্য দিয়ে তাই সে ফিরে পেল। পরার্থে জীবন উৎসর্গ করার সংকল্প গ্রহণ করল যতীন ও মাধবী।

মাঝখানে কিছু জটিলতা দেখা দিলেও, যেমন রজত ও মাধবীর এবং যতীন ও রমলার মধ্যে কাল্পনিক এক সম্পর্ক নিয়ে ক্ষোভ ও অভিমান, পরিণামে এক মধুর ও স্নিগ্ধ মিলনে এর সমাপ্তি। হাজারিবাগেই স্থায়ীভাবে বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়ে রজত ফিরে পেতে চাইল মানসিক মুক্তি, কবি প্রকৃতির স্বকীয় উল্লাস।

ভাবে-ভাষায়, শুচিতায়-সংযমে, কাব্যিক বর্ণনা ও ঘটনার বিন্যাসে উপন্যাসটি সেকালে যে প্রভূত জনসমাদর লাভ করেছিল তা নিরর্থক নয়। রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন, যে সৌন্দর্যসুষমামণ্ডিত রুচিস্নাত পরিবেশ ঘিরে থাকত তাঁর রচনায় রমলা সেই ধারা ও আদর্শকে পুরোপুরিই অনুসরণ করেছে। শুরুতেই যে বর্ণনা তা অনেকটাই যেন রবীন্দ্রধারার অনুবর্তী। "রক্তের মত রাঙা লাল মাটির পথ। আলোছায়ায় কত শালবনের তলে তলে, কত গ্রামের পাশে পাশে আঁকিয়া বাঁকিয়া, কত নদী ডিঙাইয়া, কত প্রান্তর পার হইয়া পথটি চলিয়াছে; চলিতে চলিতে কখন যেন শ্রান্ত হইয়া পৃথিবীর বুকে নামিয়া পড়িয়াছে, আবার লাফাইয়া উঠিয়া সুদূরে দিগন্তের নীল মায়ার দিকে ছুটিয়াছে।

...তাহারই উপর চক্রবাল রাঙাইয়া রক্তমেঘস্তূপে সূর্য অস্ত যাইতেছে, যেন

কোন নীড়হারা পথিক-বিহঙ্গ দুই রাঙা ডানা মেলিয়া দিনশেষে রাত্রির অনন্ত তারালোকের দিকে উড়িয়া চলিয়াছে, কোন প্রেম বেদনায় তীরবিদ্ধ, তাহার চঞ্চল বক্ষ হইতে রক্ত চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছে।" যখন রজতের মনে রমলার প্রতি প্রথম প্রেমের সঞ্চার হল, তখন 'রমলা পিয়ানো বাজাইয়া চলিয়াছে, সুরপরীরা সমস্ত ঘর নৃত্য করিয়া ঘুরিতেছে, রজত বিমুগ্ধ নেত্রে পিয়ানোবাদিনীর দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিল।' উপন্যাসের মধ্যে যেটুকু বিষাদ, অন্ধকার সেখানেও লেখক এই কবিসুলভ বর্ণনা ত্যাগ করেননি। 'শব্দের ইন্দ্রজাল কুহকে, বর্ণনার কবিত্বময় অন্তরঙ্গতায়' সমগ্র কাহিনীটি আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

এই উপন্যাসে গভীর জীবনবোধ বা কোন জাগতিক সমস্যার বিষয় আলোচিত হয়নি বা কোন জটিল মনস্তত্ত্ব, কুটিল স্বার্থপরতা এসে অযথা ভারাক্রান্ত করেনি মূলগত কাহিনীসূত্রকে। যেটুকু বিষাদ বা অপ্রীতি আছে তা এসেছে যেন কেন্দ্রস্থিত সৌন্দর্য চেতনাকে আরো দীপ্তিময় উজ্জ্বল করে তুলতে। তাই বেদনা বা কারুণ্য কিছুই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু তাই বলে এর আকর্ষণ বিন্দুমাত্র যে কমেনি তার কারণ এর সুখপাঠ্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা। যে সকল মনে শুধু কল্পনা বা ভাবাবেগ, তাই যে একেবারে অচল এবং পরিত্যাজ্য তা তো নয়। যেহেতু মন নামক বস্তুটির একটি পৃথক সত্তা রয়েছে তাই ভিন্ন ভিন্ন লোকের ক্ষেত্রে তার স্ফুরণও হবে পৃথক ভাবে। মণীন্দ্রলাল ভাবলোকের শিল্পী, এই ভাবনাকে সঞ্জীবিত করার জন্য যেটুকু বস্তুতন্ত্রতা প্রয়োজন ততটুকুই তিনি আহরণ করেছেন, তার বেশী নয়। তাছাড়া বিশেষ পরিস্থিতিতে এই ভাবরাজ্য বা কল্পনার ক্ষেত্রও তো বাস্তব হয়ে দেখা দেয়।

বাংলা সাহিত্যে যাঁরা ইয়োরোপের জীবনকে নিযে এসেছেন, অন্নদাশংকর, দিলীপকুমার রায়ের লেখায় যার অজস্র বৈভব, মণীন্দ্রলালের রচনায় তারও পূর্বাভাস পাওয়া যায়। বিদেশী সাহিত্যের জ্ঞান, বিদেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সুনিপুণ কৌশলে তিনি বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত করেছেন। সেদিক থেকে তাঁকে অন্যতম পূর্বসূরী বলা চলে।

এত সব সত্ত্বেও তাঁর স্থান যে আজ অতি সংকুচিত তার প্রধান কারণ, সাজিয়ে গুছিয়ে নৈবেদ্য রচনায় তাঁর অনীহা বা সমকালীন সমস্যাদি সম্পর্কে পরম ঔদাস্য। তাঁর 'রমলা' সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শেষে মন্তব্য করেছেন, "হয়ত লেখকের জীবন অভিজ্ঞতার অন্তরঙ্গতার তুলনায় বৈচিত্র্য কম ছিল।

কারণ যাহাই হউক, প্রথম রচনার উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি লেখক পরবর্তী জীবনে পূর্ণ করিতে পারেন নাই এই অনুযোগ তাঁহার কৃতিত্বকে কিছুটা ম্লান করিবে।"

বাস্তবিকই আমাদের সকলেরই এই একই অভিযোগ। যদি তিনি আর একটু মনোযোগী, তৎপর এবং উদ্যমী হতেন তবে বাংলা সাহিত্য তাঁর কাছ থেকে আরো বেশী কিছু পেত। এমন বিদগ্ধ ও রসগ্রাহী কল্পনামণ্ডিত কবিপ্রতিভা যেন পূর্ণ প্রস্ফুটিতই হল না। তবু পাইনি যা তার জন্য আক্ষেপ বা অনুযোগ না করে বরং যা পাওয়া গেছে তাকে যথার্থ মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে মনে রাখলেই তাঁর প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হবে।

অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮)

অনুরূপা দেবীকে এক সময় সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। অনেকটা যেন বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সম্রাট আখ্যার সঙ্গে সুর মিলিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের আগেও বাংলা উপন্যাস রচিত হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত উপন্যাস বলতে যা বোঝায় তার সৃষ্টি যেমন তাঁরই হাতে, তেমনি অনুরূপা দেবীর পূর্বেও মহিলা লেখিকা রয়েছেন যাঁরা গল্প উপন্যাস ইত্যাদিতে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন —কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবননিষ্ঠ, উন্নত মানের উপন্যাসের সার্থক সূচনাতে যে সকল মহিলা ঔপন্যাসিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে, অনুরূপা দেবীর স্থান তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চে। তাছাড়া বৈদগ্ধ, মননশীলতা, স্বজাতিপ্রীতি ও স্বধর্মনিষ্ঠাতে অনুরূপা দেবী অনেকটাই বঙ্কিমানুসারী, স্বীয় আদর্শ ও জীবনবোধে, দৃঢ় প্রত্যয় এবং হয়ত এই কারণেই অনেকে তাঁকে সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী বলে সম্মান দিতেন।

কালের প্রবাহে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই আসনটি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে, অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত হয়েছে তাঁর সম্রাটত্ব। কিন্তু অনুরূপা দেবীর ক্ষেত্রে একথা বলা যায় না। বরং তাঁর খ্যাতি ও কীর্তি আজ ক্রমবিলীয়মান হতে হতে অনেকটাই নিঃশেষিত। বিষয়ের বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তিতে, ভাষা ও যুক্তির প্রাখর্যে তাঁর রচনাবলী এক সময় যে সম্ভ্রম ও প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল পরবর্তী কালে সেই রেশ অতি অল্প সময়েই মিলিয়ে গিয়েছিল। এমন কি তাঁর রচনা নিয়ে কোন বাদানুবাদ বা সাহিত্য বিতর্কের সৃষ্টি হয়নি যার দ্বারা প্রমাণ হয় 'মা', 'মহানিশা', 'মন্ত্রশক্তি' প্রকাশকালে যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিল পরবর্তী কালে অধিকাংশের মন থেকে তা মুছেও গিয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি। তাই বলা যায় পরবর্তী প্রজন্মে, কি লেখক কি লেখিকা, অনুরূপা দেবীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিশেষ কিছুই পড়ে নি। হয়ত এর জন্য দায়ী তাঁর বিশেষ মানসিকতা ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী। তবে সাহিত্যে কোন নতুন ধারার প্রবর্তন করুন বা নাই করুন, ভবিষ্যৎ বংশীয়দের মধ্যে প্রভাব থাক বা নাই থাক এক সময়ে তিনি

যে সাধনায় ব্রতী ছিলেন, যে নিষ্ঠা একাগ্রতা ও মণীষার জন্য তাঁকে মহিলা লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হত তা সেদিনের পরিপ্রেক্ষিত ও পটভূমির বিচারে অমূলক বা অসংগত ছিল না। আর সেই জন্যই তাঁর প্রতি আমাদের সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনও অবশ্যকর্তব্য।

উনবিংশ শতাব্দীর যে সাধনা ও ঐতিহ্য নিয়ে বর্তমান শতাব্দী সগর্ব ও সোচ্চার যাত্রা শুরু করেছিল তার মধ্যে নারী জাগরণের অধ্যায়টি বিশেষ ভাবেই চিহ্নিত। অবশ্য এটা সর্বজনস্বীকৃত সে উন্মেষে নারীদের চাইতে পুরুষের প্রচেষ্টা ও প্রতিভার অবদানই বেশী। বিশেষ করে বিদ্যাসাগর মধুসূদন প্রভৃতি মণীষীদের রচনাসমূহে নারীমুক্তির বিষয়টি এক নতুন তাৎপর্য ও বিশেষত্ব নিয়ে উদ্ঘাটিত। মহিলা লেখক ও কবিগোষ্ঠী তখন তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক গন্ডীর মধ্যে থেকেই সাহিত্য সৃজনে নিয়োজিত ছিলেন, পুরুষের প্রাধান্য ও প্রভুত্বকে স্বীকার করে। কোন অর্গলভাঙ্গা বৈপ্লবিক চিন্তাধারা তখনো অংকুরিত হয়নি তাঁদের মানসলোকে। নারীকে স্বধর্মে ও স্ব-ভাবে ফিরিয়ে আনাই ছিল তাঁদের অভীপ্সা আর বহু যুগ ধরে যে সামাজিক বিধি-নিষেধ তাদেরকে দুর্বল ও পংগু করে রেখেছিল তার বিরুদ্ধে মৃদু কোমল প্রতিবাদের আভাসও ছিল তাঁদের রচনায়। কখনো মান অভিমানের মধ্য দিয়ে মৃদু অনুযোগের সুর, আর কখনো বা অবহেলা ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে লঘু বিদ্রোহ-গুঞ্জন ধ্বনিত হয়েছিল তাঁদের লেখায়। কিন্তু ন্যায়নীতি বোধ কিংবা সামাজিক সুস্থিতি বিঘ্নিত করার মত মানসিক পরিকাঠামো তাঁদের ছিল না অথবা এ ধরণের চিন্তাকে কোনক্রমেই প্রশ্রয় দিতে চাইতেন না।

মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রথম উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব স্বর্ণকুমারী দেবীর, এ তথ্য সকলেরই স্বীকৃত। তবে তাঁর রচনা কতটা সার্থকতামন্ডিত; সে বিষয়ে আজ যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আছে। ঐতিহাসিক যেসব উপন্যাস তিনি লিখেছেন তা অনেকটাই বঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশচন্দ্রের দুর্বল অনুসরণ। তবে সামাজিক দু-একটি উপন্যাসে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। স্বর্ণকুমারী দেবীর পরবর্তী মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে অনুরূপাদেবী, নিরুপমা দেবী, সীতা দেবী শান্তা দেবীর নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত চারজনের মধ্যে নিরুপমা দেবী ও অনুরূপা দেবী কিছুটা রক্ষণশীল আর সীতা দেবী ও শান্তা দেবী সেকালের নিরিখে প্রগতিশীলা, অর্থাৎ আমাদের ধর্মীয়,

সামাজিক ও পারিবারিক রীতি নীতি, আচার পদ্ধতির প্রতি প্রথমোক্ত দুজনেই গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তাই এঁদের রচনায় সেই সব মূল্যবোধেরই প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। আর সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর রচনায়, নব্য শিক্ষিতা নারীদের, বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনে নারী সমাজে যে নতুন চেতনা ও ভাবের উন্মেষ ঘটেছিল তারই রূপায়ণ। তবে দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা যাই হোক না কেন, প্রতিভা ও মননশীলতায় অনুরূপাদেবীর স্থান এঁদের সকলেরই উপরে।

অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবীর রচনাকে একই পর্যায়ভুক্ত বলে অনেকে মনে করেন। এঁদের রচনার তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "ইহারা একই পর্যায়ভুক্ত, ইহাদের আদর্শ, মনোভাব, জীবন সমালোচনার ধারা ও বিশ্লেষণ-প্রণালী অনেকটা এক রকমের। ইঁহাদের মধ্যে তুলনায় আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা কঠিন। অনুরূপা দেবীর অধিকার-ক্ষেত্র বিস্তৃততর; তাঁহার উপন্যাসের সংখ্যা ও বিষয়বৈচিত্র্য নিরুপমা দেবী অপেক্ষা অনেক বেশি; নিরুপমা দেবীর কলাকৌশল অধিকতর সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত। অনুরূপার মন্তব্য অনেক সময় পান্ডিত্য ভারাক্রান্ত ও গুরুপাক; নিরুপমার মন্তব্যের মধ্যে এই দোষের প্রায় সম্পূর্ণ অভাব; অত্যুক্তি প্রবণতা ও অসংযত উচ্ছ্বাস তিনি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বর্জন করেছেন। সৃষ্টি শক্তির দিক দিয়া অনুরূপার শ্রেষ্ঠত্ব; কলাকুশলতা ও চিত্তবিশ্লেষণে নিরুপমাই বোধ হয় প্রাধান্যের দাবী করিতে পারেন। নিরুপমার সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস 'দিদি' বোধহয় অনুরূপার সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস 'মন্ত্রশক্তি' হইতে উচ্চতর সৃষ্টি। উচ্ছ্বসিত, আবেগময় দৃশ্য-চিত্রণে নিরুপমা অনুরূপার সমকক্ষ নহেন; মন্ত্রশক্তি পথহারা, বাগ্‌দত্তা ও মহানিশা হইতে এইরূপ তীব্র, অগ্নিজ্বালাময়, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আলোড়নের অনেক দৃষ্টান্ত সংকলিত হইতে পারে। নিরুপমার চিত্ত-বিশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত ধীর, সংযত ও বাহ্য বিক্ষোভ অপেক্ষা অন্তর-গভীরতার লক্ষণাক্রান্ত।"

বিদগ্ধ সমালোচকের উল্লিখিত উক্তিকে মেনে নিয়েও বলা যায় চিত্ত-বিশ্লেষণ ও অন্তর-গভীরতার নিদর্শন অনুরূপা দেবীর উপন্যাসে খুব অলভ্য নয়। পথহারা, মহানিশা, মন্ত্রশক্তি প্রভৃতি উপন্যাসে এই সব লক্ষণ দুর্লভ তো নয়ই বরং উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি হিসাবে তা চিরস্থায়ীত্বের দাবীই রাখে। সেহেতু বিগত

যুগের সমস্যাবলী ও জীবন যাত্রার মান ও প্রণালী আজ থেকে অনেকটাই পৃথক তাই যে সব সমস্যা ও সংকটগুলি অনুরূপাদেবীর রচনার মুখ্য বিচার্য ও প্রতি-পাদ্য ছিল, আজ তা মামুলী ও তাৎপর্যহীন। তবে সাময়িকতার সেই গন্ডী ভেদ করেও কিছু কিছু সমস্যা রয়েছে যা নরনারীর চিরকালীন হৃদয়ঘটিত এবং সে সবের আবেদন ও আকর্ষণও তাই আজও আমাদের আলোড়িত মথিত করে। অনুরূপা দেবী এখনো সম্পূর্ণ অপাংক্তেয় হন নি এই কারণে যে কিছু চিরন্তন সাহিত্যরস তাঁর রচনায় রয়েছে। তাঁর মা, মহানিশা, মন্ত্রশক্তি, পথহারা প্রমুখ উপন্যাসগুলিতে এই সর্বকালীন আবেদন ও আকুতি আজও কম আকর্ষণীয় নয়। মা উপন্যাসে ব্রজরাণীর মাতৃহৃদয়ের বুভুক্ষা ও পারিবারিক শান্তিতে বঞ্চিতারূপ, মহানিশাতে অপর্ণার জটিল সমস্যা ও তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ, মন্ত্রের অমোঘ শক্তির প্রতি বাণীর দুর্বার দুর্জয় আকর্ষণের জন্য মর্মান্তিক পরিণতি এবং পথহারাতে রাজনীতি ও সন্ত্রাসবাদের যূপকাষ্ঠে কয়েকটি তরুণ তরুণীর উম্মাদ আত্মনিবেদন, এ সবই চিত্রিত হয়েছে উচ্চাঙ্গের শিল্পদৃষ্টিতে, গভীর জীবনবোধে।

অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের সংখ্যা ত্রিশের অধিক। এর মধ্যে রয়েছে 'মা', 'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা,' পথহারা,' 'গরীবের মেয়ে', 'চক্র', 'হারানো খাতা', 'পোষ্য-পুত্র', 'উত্তরায়ণ,' 'পথের সাথী', 'বাগ্‌দত্তা, 'জ্যোতিঃহারা' প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাস এবং 'রামগড়' ও 'ত্রিবেণী' এই ঐতিহাসিক উপন্যাস দুটি। সবগুলিই একসময় যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যদিও মন্ত্রশক্তি, মহানিশা এবং পথ হারাই কেবল উচ্চাঙ্গের রচনা বলে সর্বজনস্বীকৃত। আর জনপ্রিয়তার দিক থেকে বোধ হয় 'মা' উপন্যাসেরই শ্রেষ্ঠত্ব।

মন্ত্রশক্তিতে লেখিকা অসাধারণ কল্পনাশক্তি ও বাস্তব বোধের পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগীয় ভাবধারায় পরিপালিত রাজনগরের জমিদারগোষ্ঠী, বংশ পরম্পরায় কৌলিন্য ও বৈষ্ণবতন্ত্রের তাঁরা ধারক ও বাহক। এই বংশের সার্থক প্রতিনিধি জমিদার হরিবল্লভবাবু। কোন কুলপ্রথায় সামান্যতম বিচ্যুতিও তিনি মার্জনা করেন না। আর তাঁর পুত্র রমাবল্লভ কিন্তু অনেকটাই উদারপন্থী, নব্যশিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত। রমাবল্লভের একমাত্র মেয়ে বাণী। হরিবল্লভের ইচ্ছানুসারে এবং বংশগত নিয়মের অনুশাসনে বাণীকে বিয়ে করতে হল পুজারী অম্বরনাথকে। এ বিয়ে না হলে সকল জমিদারীর

স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হাত হবে রমাবল্লভকে। বুদ্ধিমতী স্বাধীন-স্বভাবা বাণী মত দিল বিয়েতে। কিন্তু যার সংগে তার বিয়ে সেই অম্বরনাথ ঘটনাচক্রে তাঁদের গৃহদেবতা দেব-বিগ্রহ গোপীনাথ জীউর পূজারী। নিয়তিনির্ধারিত সেই বিবাহ স্থির হবার পরেই বাণী মনে মনে সংকল্প গ্রহণ করে সে আজীবন গোপীনাথ জীউর পূজোর্চনায় দিন কাটাবে। কোন পারিবারিক বা সামাজিক গার্হস্থ্য জীবন যাপন করবে না। তাই একদিন বিবাহের পূর্বে লাজুক, নম্র, মিতভাষী অম্বরনাথকে ডেকে বলে, "আমার একটা কথা ছিল, এই সময়েই সেটা বলা ভাল। যদি বাবা যা বলেছেন, তাই করতে হয়, তবে বিবাহের দিন থেকেই আমি স্বতন্ত্র থাকতে ইচ্ছা করি। সেই দিন ছাড়া এ জন্মে আর দুজনের মধ্যে দেখাশোনা হবে না। দুজনের কেউ কারো খোঁজ নেব না, এই আমার ইচ্ছা।" অম্বর ঠিক এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। বাণীর সংগে বিবাহ এটা যেমন তার কল্পনার মধ্যে ছিল না, তেমনি গরীব ও পরের আশ্রয়ে জীবন নির্বাহকারী হওয়া সত্ত্বেও একটা স্বাধীন ও দৃঢ় মতামতের অধিকারী ছিল সে। ছিল প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ ও অনুচ্চারিত ব্যক্তিত্ব। তাই "সেই রাত্রির আলোকে অকস্মাৎ অম্বরের মুখখানা পাংশু হইয়া গেল। এত বড় নিষ্ঠুর শর্তে কেহ কি কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে? সে জোর করিয়া সেই সুগন্ধ ভারাকুল মন্দির বায়ু হতে একটা উর্ধ্বশ্বাস গ্রহণ করিয়া আর্ত কণ্ঠে উত্তর করিল, 'আচ্ছা'।"

যথারীতি বিয়ে হয়ে গেল। বাণী ও অম্বরনাথ দুজনেই দুই বিপরীত মানসিক চাপে ক্ষতবিক্ষত। পূজোর্চনায় রত অবস্থায় বাণী কোনদিন অম্বরনাথের দিকে পরিপূর্ণভাবে দৃষ্টিপাত করে নি। পূজারী ব্রাহ্মণ, তাদের অন্নেই সে প্রতিপালিত, কাজেই কোন কৌতূহল বা শ্রদ্ধা তার প্রতি বাণীর ছিল না। 'প্রতিদিন বসিয়া তাহার পূজো দেখে। মনে মনে সাতবার করিয়া তাহার কাজের সমালোচনা করে, কিন্তু বাহিরে সে মুখ ফুটিতে পারে না।' কিন্তু বিবাহের পরে ফুলশয্যার রাতে ক্লান্ত ঘুমন্ত অম্বরনাথকে দেখে সে চমকে ওঠে। সারা মুখ জুড়ে রয়েছে অপরিসীম ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা ও বিষাদ। সে মনে মনে ভাবে, "এই অম্বরনাথ? এই তাহার স্বামী? এই সমুজ্জ্বল রক্তবস্ত্র-পরিহিত মহাদেবতুল্য সৌম্য সুন্দর কান্তিমান পুরুষ—এই কি সেই লজ্জা-ভয়-বিজড়িত দীন পুরোহিত? কোথা হইতে চুরি করিয়া অথবা কোন দেবতার আরাধনাবলে সে এই অতুলনীয় রূপযৌবন লাভ করিয়া আসিল? সে কি উপকথার ছদ্মবেশী

রাজপুত্র ? কিংবা সে কোন অভিশপ্ত দেবতা বা গন্ধর্ব ?" কিন্তু এই মোহ বা রূপতৃষ্ণা অতি সাময়িক, কয়েকদিনের মধ্যেই অবার যথারীতি বাণী সব ভুলে গৃহদেবতার পায়েই নিজেকে সমর্পণ করল আর অম্বরনাথ পূর্ব প্রতিশ্রুতিতে সেই গৃহ ত্যাগ করে চলে গেল অনেক দূরে। এর পর বাণীর মাতৃবিয়োগ এবং সে আরো নিঃসঙ্গ আত্মলীন হয়ে ওঠে। কিন্তু তবু মনের কোণে থেকে যায় কি একটা অব্যক্ত ব্যথা। যে অভিমান ও বেদনা নিয়ে অম্বরনাথ বহুদূরে রয়েছে তাই যেন তাকে বারবার নিপীড়ন করতে থাকে। মনের মধ্যে নিরন্তর অনুভব করে এক তীব্র দহন। আর সেই দহন সে নির্বাপিত করতে চায় দেবতার সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগের মাধ্যমে। যতই তার জ্বালা অনুশোচনা বাড়তে থাকে ততই যেন নিজেকে বিলোপ করে দেয় পূজার্চনার মাধ্যমে। কিন্তু মনের আগুন তো অত সহজে নিবে যাবার নয়, তাই অবিরাম ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে আত্মগ্লানিতে। এমন সময় খবর আসে সুদূর প্রবাসে অম্বরনাথ রোগশয্যায় মুমূর্ষু প্রায়। এতদিনের ধূমায়িত সব জ্বালা-যন্ত্রণা অর্গলমুক্ত হয়ে বাণীকে নিয়ে গেল সেই মুমূর্ষু স্বামীর পাশে। বিস্মৃত হল পূর্বের সব সংকল্প। অতি যত্নে মমতায় সেই অস্থিচর্মসার স্বামীর দেহ তুলে নিল, পরম স্বস্তি আর শান্তিতে অম্বরনাথ যেন প্রাণ ফিরে পেল। আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে অম্বরনাথ চিঠি লিখেছিল বাণীর উদ্দেশে। "আমার মৃত্যুতে দুঃখিত হইও না। আমার মৃত্যুতে লোকে তোমায় না বুঝিয়া বিধবা বলিবে—হয়ত দেশাচারক্রমে কিছু ক্লেশ ভোগও অনিবার্য, কিন্তু আমি জানি তুমি চির-সধবা। ভগবানে যে প্রাণ সঁপিয়াছে তাহার কখনো বৈধব্য ঘটিতে পারে না।" মুমূর্ষু স্বামীর এই অন্তিম চিঠি বাণীকে নতুন করে জীবনের ইঙ্গিত ও তাৎপর্য এনে দিল। স্বামীর সেবাতেই সে নতুন করে নিজেকে নিবেদন করল। এ কোন স্বামী ? যাকে সে কখনো মানুষ বলে গণ্য করে নি, স্বামী হিসাবে শ্রদ্ধা ভালোবাসা তো দূরের কথা।

মন্ত্রশক্তির সমগ্র কাহিনীই এক সূত্রে, একই ভাবগম্ভীর করুণ সুরে রচিত। কাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতা, চরিত্রগুলির বাস্তবতা, ভাষা ও বর্ণনার স্বচ্ছতা কোথাও অতিরঞ্জন বা অতিকথনে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি। বাণীর চরিত্র বাদ দিলেও অন্যান্য চরিত্রগুলিও স্বাভাবিক ও প্রাণময়। জমিদার হরিবল্লভ, বাণীর পিতামাতা রমাবল্লভ ও কৃষ্ণপ্রিয়া সকলেই অতি জীবন্ত ও সুপরিস্ফুট। রমা-

বল্লভের কন্যাস্নেহ ও বংশকৌলিন্য বজায় রাখার প্রচেষ্টার মধ্যে যে মানসিক সংঘাত, মাতা কৃষ্ণপ্রিয়ার সন্তানস্নেহ ও স্বামীর প্রতি দুর্জয় অভিমান খুবই স্বাভাবিকভাবে বর্ণিত। প্রাচীন পুরোহিত আদ্যনাথের অহংকার, পাণ্ডিত্যের গর্ব, গোঁড়ামি এবং তরুণ অম্বরনাথের প্রতি অহেতুক বিদ্বেষ তাঁকে সেকালের এই শ্রেণীভুক্ত লোকদেরই সার্থক প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিভাত করেছে।

এই উপন্যাসের একটি Sub-plot মৃগাঙ্ক ও অম্বুজাকে নিয়ে। সাময়িক ভুলভ্রান্তি ও মান অভিমানের মধ্য দিয়ে এদের বিচ্ছেদ ঘটেছিল, তা পরে মিলনেই সমাপ্ত। মৃগাঙ্ক ও অম্বুজার দাম্পত্য জীবনের যে ঘটনা তা অনেকটা মূল কাহিনী অর্থাৎ বাণী ও অম্বরনাথের সম্পর্ককে আরো গভীর ও তীব্র করে তুলতে সাহায্য করেছে। এই খণ্ডচিত্রটি মূল ঘটনার যেন অনেকটা পরিপূরক হিসাবেই উপস্থাপিত।

আর সকলের উপরে রয়েছেন গৃহদেবতা গোপীনাথজীউ। অচেতন একটি বিগ্রহকে এমন প্রাণময় ভাষাময় ক্রিয়াশীলরূপে বাংলা উপন্যাসে আর কোথাও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। অথচ সেই মূর্তি বা বিগ্রহকে দিয়ে কোন অলৌকিক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটানো হয় নি, যার ফলে আমাদের মনেও কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। বাণীর সকল সুখ-দুঃখ-জ্বালা যন্ত্রণার সে যেমন নীরব সাক্ষী, তেমনি সব কিছুরই উপশমকারী, সকল যন্ত্রণাহারী। গৃহদেবতা গোপীনাথ জীউকেও তাই উপন্যাসের একটি চরিত্র বলে ধরে নেওয়া যায়। বাণীর মানসিক পরিকাঠামো, তার পরিবেশ, আজন্মলালিত সংস্কার পিতামাতা গুরুজনদের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা এ সব বিচার করলে গোপীনাথজীউ যে তার জীবনের একমাত্র উপায় ও অবলম্বন হবে তা মেনে নিতে কোন কষ্ট হয় না। বিগত শতাব্দীর হিন্দু পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনে এই দেবপূজা, আচার অনুষ্ঠান, ধূপ-দীপ-শঙ্খ-ঘন্টা, মন্ত্রোচ্চারণ সবই ছিল প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত সত্য। আর কি ব্যক্তিজীবনে, কি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এই ধর্মীয় ভাব ও আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব ছিল অপ্রতিরোধ্য। এমনকি শিক্ষিত ও যুক্তিশীলদের মধ্যেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। সেখানে আজন্ম একটি বিশেষ ধর্মীয় আব-হাওয়ায় প্রতিপালিতা বাণী যে তার নিঃসঙ্গ, ক্লিষ্ট, ব্যথাদীর্ণ জীবনে এই গৃহদেবতাকেই পরম অবলম্বনরূপে গ্রহণ করেছিল এটা খুবই স্বাভাবিক। আর সেই কারণেই গোপীনাথ জিউর উপস্থিতি কাহিনীর গতিকে কোন অলৌকিক

অবাস্তব পথে না নিয়ে মূল স্রোতকেই আরো গতিশীল ও স্বাভাবিক করে তুলেছে।

মোটের উপর 'মন্ত্রশক্তি' অনুরূপা দেবীর শ্রেষ্ঠ রচনাই শুধু নয়, বাংলা উপন্যাসের তালিকায় একটি স্মরণীয় সৃষ্টি। এর ভাষা, প্রকৃতি-বর্ণনা, ঘটনার পারম্পর্য এবং চরিত্রসমূহের গভীরতা সব কিছুই উচ্চাঙ্গের রসকল্পনাসমৃদ্ধ। ভাষার আড়ম্বরতার জন্য তাঁর যে কিছুটা দুর্নাম ছিল, মন্ত্রশক্তি সে দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। মনে হয় সহজ স্বাভাবিক ভাবেই তা লেখিকার কলম থেকে উৎসারিত। মাঝে মাঝে কল্পনা কবিত্ব ও দার্শনিকতায় অনবদ্য হয়ে উঠেছে। "নদীতীরে এদিকে কাহারও ঘর বাড়ী নাই। যতদূর দৃষ্টি চলে মখমল সবুজ তীরভূমে সুদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র সীমায় বিবিধ ছায়াতরু ও লতাগুল্মের প্রকৃতি-রচিত চারু কুঞ্জবন। শস্যক্ষেত্রে আজ ধান্য ফলিয়া উঠিতেছে; নবীন শীর্ষগুলি মন্দ বাতাসে ক্রীড়াশীল সুকুমার শিশুগুলির মতই নৃত্য করিতেছে। বাধাহীন বিস্তৃত মাঠের সুদূর সীমানায় কৃষকপল্লীর ছোট কুটীরগুলি অমল রৌদ্রস্নাত হইয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। একস্থানে একটা পৌরাণিক বট-বৃক্ষ জটাভার চারিদিকে বিস্তৃত করিয়া দিয়া তপস্যাপরায়ণ সন্যাসীর মত দূরে অনন্তে নিবদ্ধ দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া অনন্ত শক্তির ধারণায় নিবিষ্ট হইয়া আছে। তাহার পদতলে কত লতা, কত গুল্ম কত তরু জন্মিল। কত সুখ দুঃখের অভিনয় স্মৃতি তাহার সবল বক্ষে মুদ্রিত করিয়া দিয়া কালসমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গে মিশিয়া লয় হইয়া গেল। গতিশীল জগৎ নিজের গতিপথে অবাধ বিচরণ করিতেছে; প্রতিপদে সে জীবনের অনিত্যতার গান গাহিয়া চলিয়াছে, তাহার মাঝখানে নিত্যবস্তুর শরণাগত অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত জীবন্মুক্ত সাধকের মতই সে অটল, অচল, দণ্ডায়মান। কাল যেন তাহার কাছে ঘেঁষিতেও সাহস করে না।

অম্বরনাথ চিন্তিতমুখে সেই বটমূলে আসিয়া দাঁড়াইল।" একটা পরিচ্ছন্ন নিটোল গ্রাম্য ছবি। যেন আমাদের চোখের সামনেই উদ্ভাসিত।

মন্ত্রশক্তির পরেই বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে 'মহানিশা' উপন্যাস। এখানেও অনুরূপা দেবীর মৌলিকতা এবং কল্পনাশক্তির অপরিমেয় ক্ষমতার পরিচয় আমরা পাই। এবং অসংশয়ে বলা যায় মহানিশাও আপন ঔজ্জ্বল্যে উপন্যাস সাহিত্যে সগৌরব স্থানের অধিকারী, কালের গন্ডী-অতিক্রমী।

এই উপন্যাসে দুটি পরিবারের পরিচয় পাওয়া যায় যা দুটি ভিন্ন ধারায়

প্রবাহিত হয়ে পরে একটা আপোষজনক ঘটনায় পরিসমাপ্ত হয়েছে। বৃদ্ধ রাধিকা-প্রসন্ন একা থাকেন গ্রামের বাড়ীতে ভৃত্য বিহারীকে নিয়ে। একদা ছিল অতি সচ্ছল অবস্থা। আজ প্রায় ক্ষয়িষ্ণু। রাধিকাপ্রসন্ন নির্বান্ধব, স্বজনবিহীন, এমন সময় তাঁর কাছে আশ্রয়ের জন্য আসে দূরের আত্মীয়া সৌদামিনী ও তার কন্যা অপর্ণা। প্রথমে যথারীতি বিরক্ত ও বিব্রত বোধ করলেও সৌদামিনী ও অপর্ণার আশ্রয় জোটে। আর বিহারীও যেন সৌদামিনী ও অপর্ণাকে পেয়ে নতুন জীবনের সন্ধান পেল। মা মেয়ের সুখের জন্য সে নিজেকে উজাড় করে করে দিতে প্রস্তুত। সে এতদিন নিঃসঙ্গ একা ছিল। সৌদামিনী ও অপর্ণার অভিভাবকত্ব যেন বিহারীর উপর স্বাভাবিকভাবেই বর্তালো। অপর্ণাকে সৎ-পাত্রস্থ করার জন্য বিহারীর উদ্যোগ আয়োজনের বিরাম ছিল না। হতাশাগ্রস্ত সৌদামিনীকে সে আশ্বাস দিত অপর্ণা রাজরাণী হবে। কিন্তু কিছুতেই ভাল পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেল না, যদি বা পাওয়া যায় তো নানা আবর্তে সেই সম্বন্ধ কখনো বাস্তব হয়ে ওঠে না। এদিকে সৌদামিনীর শরীর ভেঙে যেতে লাগল আর অতি অস্থির চিত্তে সে ভাবে মৃত্যুর পরে অপর্ণার কি হবে। বিহারীর চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। মা ও মেয়ের সুখের জন্য সে বোধ হয় নিজেকেও বিসর্জন দিতে পারে। "এ পৃথিবীতে একটা মানুষ যে এমন হিতাহিত জ্ঞান-শূন্যভাবে তাঁদের শুভার্থী, ইহাতে তাহার নৈরাশ্য-কঠিন প্রাণটা যেন স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।" এই অনুভূতি থেকেই মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে এল, সৌদামিনী কন্যার সকল ভার বিহারীকে দিয়ে গেল, এমনকি সুপাত্র পাওয়া না গেলে যেন বিহারীই অপর্ণার গতি করে, এই অনুরোধ করল। যে সহজ সরল সম্পর্ক ও নিঃস্বার্থ স্নেহ মমতা নিয়ে বিহারী এতদিন অপর্ণার অভিভাবকত্ব করছিল সেই সম্পর্কে যেন এক নতুন অস্বস্তিকর উপদ্রব শুরু হল। অবশ্য বিহারীর মনের কোন স্পষ্ট বিবর্তন তার কথাবার্তা বা চালচলনে প্রকাশ পায় নি। সে একাধারে কর্মচারী ও অভিভাবক। এই দ্বৈত সত্তা বজায় রাখতেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এর উপরে ছিল অপর্ণার রুক্ষ ব্যবহার, অমার্জিত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এবং অকারণ অসহিষ্ণুতা। বিহারীর সকল কথা ও কাজকর্মে সে যেন স্বার্থ-সিদ্ধির অভিপ্রায়ই লক্ষ্য করত। যতই দিন অতিবাহিত হতে থাকে ততই অপর্ণা অবিরাম বাক্যবাণ ও তীব্র শ্লেষে বিহারীকে অতিষ্ঠ করে তোলে। বিহারীর পাত্র খোঁজা ও কোনক্রমে সংসার নির্বাহের প্রচেষ্টাকে সে ভালভাবে মেনে

নিতে পারে না। পরে যখন তার মনে হয় মায়ের অন্তিম ইচ্ছাও হয়ত এই ছিল, তাই সে নিজেই উদ্যোগ নেয় বিহারীকে বিয়ে করে তাকে সকল দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে। কিন্তু বিহারীর চেতন মনে এ চিন্তা কখনো ঠাঁই পায় নি, সে পালিয়ে বেড়ায়, কখনো অপর্ণার সম্মুখীন হয় না। এমন সময় নির্মলের আবির্ভাব এই অস্বস্তিকর শ্বাসরুদ্ধকারী পরিবেশের অবসান ঘটায়। এই নির্মলই ছিল তার মায়ের অভিলষিত পাত্র। সে বহুদিনের অদর্শনে অপর্ণার মন থেকে প্রায় মুছেই গিয়েছিল। যদিও কোন একটা সময় প্রথম কৈশোরে যখন বাস্তবের রুক্ষতা তার সকল কোমলতা ও মাধুরী শুষে নেয় নি, অপর্ণা হয়ত মনে মনে এই নির্মলকেই তার পতি হিসাবে ভাবত কিন্তু ঘটনা চক্রে সে যেন অতীতের স্মৃতি। তাই নির্মল যখন অনেকদিন পর অপর্ণার কাছে এল তখন অপর্ণা মায়ের শেষ ইচ্ছাকে কার্যকর করার জন্য প্রত্যাখ্যান করল তাকে, কিন্তু বিহারীর আগ্রহ ও কৌশলে শেষ পর্যন্ত অপর্ণা ও নির্মলের মিলন হয়। প্রত্যাখ্যাত নির্মল যখন দ্বিধা, সংশয় ও একটা অপরাধবোধে জর্জরিত তখন বিহারী তার পূর্ব সত্তা ফিরে পায়। "শিশুর মত প্রাণখোলা উচ্চ হাসি হাসিয়া সুখবিহ্বল বিহারী গদগদ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, আমার দিদি দিনের মধ্যে না হোক সাতবার আমাকে তাড়ায়, আমিও ভাই, সাতবার ঘুরে আসি এবার থেকে তুমিও তাই করবে দাদা। তাতে গৌরব ভিন্ন তো লজ্জা নেই।—অন্নপূর্ণার দোরে যে শিব ভিখারী—বিশ্বেশ্বর তো সে দরবারে রাজা নন।" যেটুকু সন্দেহ বা জটিলতা বিহারীর চরিত্রকে ঘিরে পুঞ্জিত হয়ে উঠেছিল তার সবটাই এই উক্তি, এই প্রয়াসের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে গেল।

আর নির্মলের উপস্থিতিও কোন আকস্মিক বা আরোপিত ঘটনা নয়। সে ছিল রেঙ্গুনে, বিখ্যাত ধনী কোটিপতি মুরলীধরবাবুর বাড়ীতে। মুরলী বাবুর কন্যা ধীরাকে সে বিয়ে করবে—অনেকটা কৃতজ্ঞতা ও করুণার বশবর্তী হয়ে, কারণ ধীরা দৃষ্টিশক্তিহীনা এবং নির্মল তাদের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে উপকৃত। কাজেই ধীরা ও নির্মলের মিলন যে সহজ ও স্বাভাবিক নয় এটা ধীরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তার মনের মধ্যে যে প্রেমের আকুতি নির্মলের ব্যবহারে তা প্রকাশিত হবার নয়। যেহেতু নির্মলের আচরণ শান্ত, নম্র ও উত্তাপহীন। নির্মলের সেবাযত্নের কোন ত্রুটি বা কার্পণ্য ছিল না কিন্তু ধীরা উপলব্ধি করত যে সেই আদর যত্ন আর যাই হোক প্রেম নয়, যৌবনের তীব্র

কামনারঞ্জিত হৃদয়াবেগও নয়। তাই ইরাবতীর বুকে নৌকাযাত্রায় কলকাতা ফেরার সময় নিজেকে সে সরিয়ে নিল এই পৃথিবী থেকে। যদিও নির্মল নিজেকে প্রস্তুত করেছিল মনে মনে গ্রহণ করার জন্য, এবং বিলম্ব হলেও ধীরার প্রতি তার প্রেম মুকুলিত হয়ে উঠেছিল কিন্তু বুদ্ধিমতী ধীরা, আত্মসম্মানবোধসম্পন্না ধীরা আর এই বন্ধনে নিজেকে জড়াতে চাইল না। ধীরার মানসিক চাপ, অন্তরের স্পন্দন অতি নিপুণ ও নিখুঁতভাবেই ফুটে উঠেছে।

অপর্ণা ও ধীরা এই দুটি প্রধান নারীচরিত্র মহানিশা উপন্যাসে দুটি পৃথক নারীসত্তার প্রতিনিধিত্ব করে। অপর্ণার রূপ গুণ যাই হোক না কেন, রোমান্টিক উপন্যাসের মোহময়ী নায়িকার মত সে নয়। বুদ্ধিমতী, প্রখর বাকচাতুর্যের অধিকারিণী ও অতিরিক্ত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্না ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তি সে, কখনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, বিপরীত পরিবেশে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও গরিমা হারায় নি। আর তারই পাশে ধীরা, শান্ত কমনীয় অপার সহ্যশীলা। বিরাট ধনীর কন্যা হয়েও কোন উগ্র দম্ভ তাকে গ্রাস করে নি। শুধু একটু ভালবাসা, একটু সহমর্মিতার কাঙাল ছিল সে। নিজের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধে সে যথেষ্ট সজাগ ছিল বলেই সকলের আদর ভালবাসার জন্য তার হাহাকার ও বুভুক্ষা।

রাধিকাপ্রসন্নর আপাত কাঠিন্যের অন্তরালে যে স্নিগ্ধ সজীব স্নেহ প্রচ্ছন্ন ছিল তার এই চরিত্রচিত্রণের মধ্যে বিশেষভাবেই সে সব পরিস্ফুট হতে পেরেছে। সৌদামিনী এক করুণ বিষণ্ণতা নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। একদা সচ্ছল অথচ আজ নিদারুণ সংকটের সম্মুখীন, আশ্রয়হারা, একমাত্র কন্যার ভবিষ্যৎ নিয়ে সদা উৎকণ্ঠিতা তার মাতৃহৃদয়ের বেদনা যেন আমরা অনুভব করতে পারি। যে অসীম হতাশা ও নৈরাশ্যের মধ্যে সে অন্তিম মুহূর্তে বিহারীকে অপর্ণার স্বামীত্বের অধিকার পর্যন্ত দিতে বাধ্য হয়েছিল সেই যন্ত্রণা প্রতি পাঠকের হৃদয়েও সঞ্চারিত হয়। আর বিহারী এক অপূর্ব সৃষ্টি। গৃহ-কর্তার প্রতি আনুগত্য ও কর্তব্যবোধ, তাদের সুখশান্তির জন্য কর্মচারীদের নিরন্তর প্রয়াস ও কৃচ্ছ্র সাধন বাংলা উপন্যাসে বিরল ঘটনা নয়। কিন্তু যে অবস্থার সম্মুখীন তাকে হতে হল সৌদামিনীর মৃত্যুর পর এবং কোনক্রমে অপর্ণার একটা সুগতি করার জন্য তার যে আকুলতা কোনভাবেই যাতে নিজের বিন্দুমাত্র দুর্বলতা প্রকাশ না পায় তার জন্য যে মানসিক সংগ্রাম তাকে করতে হয়েছিল তা অপূর্ব কুশলতায় লেখিকা বর্ণনা করেছেন। এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

যদি কেবলমাত্র মন্ত্রশক্তি ও মহানিশা এই দুটি উপন্যাসই তিনি লিখতেন তবুও অনুরূপা দেবীর অবদান ও অবস্থান মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বাগ্রেই থাকত।

উল্লিখিত উপন্যাসটি বাদে অনুরূপা দেবীর আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'পথহারা' উপন্যাস। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণশক্তির সার্থক রূপায়ণ। সে সময় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সারা দেশে পরিব্যাপ্ত এবং বিপ্লববাদের জয়গানে দেশের তরুণ সমাজ উচ্চকন্ঠ। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি কয়েকটি তরুণ তরুণী, যারা অনিবার্যভাবেই বিপ্লবের আবর্তে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলেছিল। প্রথমে শুধু একটা ভাবালুতা, অনুকরণপ্রবৃত্তির বশবতী হয়েই তারা বিপ্লবের দীক্ষা নিয়েছিল, পরে নানা ঘটনার স্রোতে এর রক্তক্ষয়ী বীভৎস রূপ দেখে সকলেই মোহমুক্ত হল, কিন্তু পরিস্থিতি তখন আয়ত্বের বাইরে। বিমলেন্দু, উৎপলা, অসমঞ্জ সকলেই এই সর্বনাশা বিপ্লবে আত্মাহুতি দিল। আপন ভাই এর মৃত্যুদন্ডে উৎপলার স্বাক্ষর প্রদান, প্রিয়তম বন্ধুর বিরুদ্ধে বিমলেন্দুর অস্ত্রধারণ, এই বিপ্লবের এক নৃশংস মূর্তি নিয়ে যখন উপস্থিত হল, উদ্ঘাটিত হল এর করুণ শোচনীয় পরিণতি তখন সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গেছে। বিপ্লবের সপক্ষে বা বিপক্ষে লেখিকার বিশেষ কোন বক্তব্য উপন্যাসের মধ্যে সোচ্চারভাবে ব্যক্ত হয় নি, শুধু যেসব অপরিণত যুবক যুবতী এক অস্ফুট ধারণার বশবতী হয়ে এতে আত্মনিয়োগ করেছিল, যার দ্বারা দেশ কিংবা সমাজ কোনভাবেই উপকৃত হয় নি তারই এক করুণ অথচ বাস্তব আলেখ্য 'পথহারা'। সমসাময়িক পটভূমিতে রাজনীতি নিয়ে লেখা যে সব উপন্যাস আমরা সচরাচর দেখতে পাই তাতে লেখকের বিশেষ ভাবধারা ও মতবাদের প্রাধান্যই লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় চরিত্রগুলি একটা বিশেষ মত ও আদর্শের ধারক ও প্রতীক হয়ে দেখা দেয়। সেদিক থেকে পথহারা অনেকটাই মুক্ত॥ রাজনীতি-প্রধান উপন্যাসগুলির মধ্যে পথহারার একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে।

'মা' অনুরূপা দেবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস। এক সময় বাঙালী পাঠক পাঠিকার হৃদয় গভীরভাবেই আলোড়িত করেছিল এই উপন্যাস। চিত্রে ও মঞ্চে এর জনপ্রিয়তা ছিল দুর্বার। তবে অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা ও অগভীর করুণ রসের আধিক্যই এতে বেশী। যেটুকু সাহিত্যমূল্য রয়েছে তা অরবিন্দ ও ব্রজরাণীর পারস্পরিক জটিল ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে। অরবিন্দের নীরব ও

গোপন অন্তর্বেদনা যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা, তেমনি ব্রজরাণীর বঞ্চনা ও অশান্তিও সুক্ষ্মভাবেই উদ্ঘাটিত। অরবিন্দের সে দ্বিতীয়া স্ত্রী, প্রথমা মৃত্যুশয্যায়। সেই অবস্থায় একদিকে নিজেকে যেমন বঞ্চিত মনে হত তার, তেমনি সংসারের পূর্ণ কর্তৃত্ব ফিরে পেতেও ছিল প্রচন্ড আকাঙ্খা। কিন্তু স্বামী অরবিন্দের উদাসীনতা, অনিচ্ছাকৃত উপেক্ষা সবই যেন অতি নির্মমভাবে বিদ্ধ করত তাকে। অবশ্য পরিশেষে সৎপুত্র অজিতের মাতৃবোধনে তার বহু দিনের পুঞ্জিত অভিমান বেদনা যেন প্রশমিত হয়ে গেল। নতুন করে বেঁচে উঠল মায়ের পরিপূর্ণতা নিয়ে। সাহিত্যমূল্য খুব উচ্চাঙ্গের না হলেও 'মা' জনপ্রিয়তায় ছিল অদ্বিতীয়। তাই বলা যায় জনপ্রিয় আবেদনে 'মা', বিষয়বস্তু ও গঠনপ্রণালীতে 'মন্ত্রশক্তি' ও 'মহানিশা' এবং রাজনীতিক পটভূমিতে রচিত 'পথহারা' অনুরূপা দেবীর সাহিত্যপ্রতিভার অনন্যতার সাক্ষ্য বহন করে।

আর একটি কারণে অনুরূপা দেবী পাঠকসমাজে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের অধিকারিণী হয়েছিলেন, তা হল ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং প্রবন্ধাবলী। অবশ্য তাঁর একপেশে মতামত ও মন্তব্যের জন্য অনেক সময় বিদ্রুপ সমালোচনাও সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁর পান্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে কোন দ্বিমত ছিল না। ইতিহাসের অনুধ্যান ও অনুশীলন, অতীতের ঘটনাবলীর মধ্যে গৌরব ও মহত্ত্বের অনুসন্ধান, বিগত যুগের কীর্তি-গাথার মন্থনের মাধ্যমে নিজেদের আদর্শ ও প্রেরণার আহরণ—সে সময়ে সকল সাহিত্যসেবীরই একটা বিশেষ প্রবণতা ছিল। প্রখ্যাত অখ্যাত সব লেখক লেখিকাই ইতিহাসকে অবলম্বন করে কাহিনী নাটক কাব্য রচনা করেছেন। পরাধীন জাতির পক্ষে ইতিহাস থেকে অনুপ্রাণনা লাভ, আর সেই ইতিহাস যদি গৌরবোজ্জ্বল হয়, একটি স্বাভাবিক মানসিকতা। বঙ্কিম-চন্দ্র, রমেশচন্দ্রকে বাদ দিলেও রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদনও এই এষণা থেকে মুক্ত ছিলেন না। অনুরূপা দেবীও এই ধারারই অনুসরণে রচনা করেছিলেন 'রামগড়' ও 'ত্রিবেণী' উপন্যাস।

'রামগড়' বৌদ্ধযুগের ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত। একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট কোশলপতির সঙ্গে লিচ্ছবি ও শাক্য রাজাদের বিরোধকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট এই কাহিনী। এর কয়েকটি মুখ্য চরিত্র ইন্দ্রজিৎ, বসন্তশ্রী, পুষ্পমিত্র, অমিতা, শুক্লা, সুদাক্ষিণা সকলেই অন্তর জ্বালায় জর্জরিত। ব্যর্থ প্রেম, হতাশা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ যেন সব চরিত্রগুলিরই বৈশিষ্ট্য। এক একটি

অধ্যায় এক একজন বিখ্যাত লেখকের রচনার অংশ থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে শুরু হয়েছে, অনেকটা বঙ্কিমের অনুসরণে। Tennyson, Scott, Cowper, Byron, Pope প্রভৃতি ইংরেজ লেখকদের লেখাংশ দিয়ে অধ্যায়গুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু সেগুলি যে সুপ্রযুক্ত তা মনে হয় না। ঘটনার বিয়োগান্তক করুণ পরিণতি স্বাভাবিকভাবে আসে নি। মনে হয় পূর্বপরিকল্পিত, বেশীর ভাগই আরোপিত, লেখিকার ইচ্ছানুসারেই আবর্তিত।

চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনাবিস্তার কখনো গতিশীলতা লাভ করতে পারে নি। ইন্দ্রজিতের মাত্রাহীন নৃশংসতার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। পুষ্পমিত্র যেভাবে মত পরিবর্তন করে শুক্লাকে গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিল তা অনেকটা সস্তা নাটকীয়তায় ভরা। "যুবরাজ ভাবিলেন 'অজ্ঞাত কুলশীলা ?' হইলই বা অজ্ঞাতকুলশীলা ? দাসী ? দাসী কি মানবী নহে ? দাসীর কি হৃদয় নাই ? ওরে নির্মম ? কেমন করিয়া এই সুবর্ণ প্রতিমা তুই চূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলি ?' গভীর আবেগে অনাদৃতা প্রিয়তমাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে পুষ্পমিত্র কহিয়া উঠিলেন,—'আমি তোমায় ছেড়ে দিতে পারবো না। শুক্লা ! রাজকন্যা হও বা দাসীই হও—যাই হও—তুমি আমার ধর্মপত্নী, তুমি আমার ! তুমি আমার !" এই উক্তিতে অনুরূপা দেবীর প্রতিভার কোন সম্যক পরিচয় নেই।

স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ এই উপন্যাসের একটি চরিত্র, কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাঁর দ্বারা পালিত হয় নি। যদিও গ্রন্থমধ্যে তাঁর বাণী রয়েছে। 'বাসনা বিতৃষ্ণার পূর্বরাগ মৈত্রী, ক্ষমা, করুণা ও খুদিতা—প্রতিহিংসাপ্রবণ লালসাপ্রদীপ্ত চিত্ত নির্বাহের পরম শত্রু উহা মায়ের বিলাস কানন।' কিন্তু এই বাণী কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি উপন্যাসের ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে কিংবা চরিত্রসমূহে কোন মহত্ত্ব আরোপে। মোটের উপর রামগড়ে বৌদ্ধযুগের কিছু প্রকৃত তথ্যাদি ছাড়া সাহিত্যোচিত বিশেষ কিছুই নেই।

অবশ্য 'ত্রিবেণী' ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে কিছুটা সার্থক। এর প্রধান কারণ বাংলাদেশের এক গৌরবময় অধ্যায়, যা এর পটভূমি। সেই পালবংশীয় রাজাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণ জাগরণ এবং সেই সময়ের জনজীবন সম্বন্ধে লেখিকার স্পষ্ট ধারণা। বৌদ্ধ যুগের সে বর্ণনায় তাঁকে শুধুমাত্র

কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছিল তথ্যাদির অপ্রতুলতায়, পালরাজাদের কীর্তি কাহিনী রচনায় সেই অসুবিধা দেখা দেয় নি, কিছু প্রামাণিক তথ্য ও উপকরণ লভ্য হয়েছিল।

কৈবর্ত সর্দার দিব্যোক ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম এই প্রজাবিদ্রোহের নায়কত্ব দিয়েছিল। পালবংশীয় রাজা মহীপালদের সারা রাজ্যে যে বিশৃঙ্খলা ও কুশাসনের সৃষ্টি করেছিল, অবাধে চালিয়েছিল প্রজাদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন তারই বিরুদ্ধে এই গণবিদ্রোহ, প্রজাদের অভ্যুত্থান। এই বিরাট গণবিপ্লবের মধ্য দিয়ে কৈবর্ত সর্দারদের সিংহাসন দখল সেই আমলের ইতিহাসে যে এক নূতন যুগ সূচনা করেছিল ত্রিবেণীতে তারই মূল সুর ধ্বনিত হয়েছে। নিতান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কলহে যে বিরোধের সূত্রপাত, সেটাই বিরাট আকার লাভ করে গণজাগরণে পরিণত হয়েছে। যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ বহুদিন ধরেই প্রজাসাধারণের মধ্যে ধূমায়িত হচ্ছিল সেটি একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গে বৈপ্লবিক রূপ লাভ করেছিল ভীমের স্ত্রী উজ্জ্বলাকে অপহরণের সূত্র ধরে। অপহৃতা প্রিয়তমা স্ত্রীকে উদ্ধার করতে এসেই এই আগুন এত ব্যাপ্তি ও প্রসারতা লাভ করে, যার ফলে পালরাজাদের উচ্ছেদ ও নতুন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু গণজাগরণের বিরাটত্ব অনেকটাই খণ্ডিত হয়েছে ভীমের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘটনাবলীর অতিরিক্ত বর্ণনায়, তাই শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসের কল্পনাসমৃদ্ধ গভীরতার পরিবর্তে অতি সাধারণ দাম্পত্য প্রেমের কাহিনীরই প্রাধান্য এই উপন্যাসে। যে চারিত্রিক দৃঢ়তা, অবিচল প্রত্যয়, সুদূর পরিকল্পনা ও মানসিক অভিলাষ থাকলে এত বড় একটা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব তা ভীম কিংবা দিব্যোকের চরিত্রে সন্নিবিষ্ট হয় নি। এই প্রধান চরিত্র দুটির যে নির্ভীকতা ও তেজের পরিচয় পাওয়া যায় তা একটা গোষ্ঠীর নায়ক হবার মত, বিরাট জনজীবনের নয়।

এই সব ত্রুটি ও অপূর্ণতা বাদ দিলে ত্রিবেণীতে লেখিকার প্রতিভার কিছু ছাপ রয়েছে। রাজপ্রাসাদের বর্ণনা, সেখানের বিলাস ও আড়ম্বর, ভ্রাতৃবিরোধ, ষড়যন্ত্র ও কুটিলতা যেমন চিত্রিত হয়েছে তেমনি অতীত দিনের জীবনযাত্রা, জনসাধারণের চালচলন, অভিলাষ ও অভিরুচি প্রভৃতি ইতিহাস-অনুমোদিত ভাবেই বর্ণিত হয়েছে। ভীম ও উজ্জ্বলার দাম্পত্য জীবনের তুচ্ছ কিন্তু অনুরাগরঞ্জিত ঘটনাবলী, দিব্যোকের স্নেহ, কর্তব্যপরায়ণতা ও বীরত্ব, উজ্জ্বলার

আত্মহত্যায় মহীপালের অন্তরের ব্যথা ও অনুশোচনা, রামপালদেবের অনন্য মহানুভবতা, ভীমের চারিত্রিক দৃঢ়তা, এ সবই অতি সুন্দর ও মর্মস্পর্শীভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব এই উপন্যাসে বিশেষভাবেই লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে ভাষার ক্ষেত্রে। প্রকৃতি বর্ণনায়, অন্তর্লোকের রহস্য, জ্বালা ও অনুশোচনা ব্যক্ত করতে, উপকাহিনী সংযোজনায় এই প্রভাব বেশীমাত্রাতেই রয়েছে। গ্রন্থের শুরুতেই দেখি, "বর্ষার মেঘব্যাপ্ত নিবিড় নিশীথ। মেঘের চন্দ্রাতপ গগনবিহারী জ্যোতিরিঙ্গনদের জ্বলন্ত জ্যোতি পৃথিবীর দৃষ্টি ঢাকিয়া দিয়াছে। চারিদিক সুপ্তি সমাচ্ছন্ন, কেবল নিবাত নিষ্কম্প বৃক্ষশাখার মধ্য হইতে অতি তীক্ষ্ন ও প্রবল স্বরে ঝিঁ ঝিঁর অশ্রান্ত ডাক শুনা যাইতেছে এবং বর্ষাজল ধারাপ্রাপ্ত ভেকবৃন্দের আনন্দ কলরবও সেই নিদ্রাচ্ছন্ন রাজধানীর অনাহত বিশ্রাম স্তব্ধতাকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে। রাজকীয় দুর্গপাদমূলে পূর্ণাবয়বা নদী করতোয়ার অর্ধস্ফুট, মৃদু কল্লোল শ্রুত হইতেছিল।" অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণ, তবে কিছুটা আড়ষ্ট এবং কৃত্রিম। ত্রিবেণী উপন্যাসে অনুরূপা দেবী যে পরিমাণে পাণ্ডিত্যের নিদর্শন রেখেছেন সেই পরিমাণে সাহিত্যিক উৎকর্ষ সৃষ্টি করতে পারেন নি। কথাটা বলা হল এই জন্য যে অন্য যে কোন লেখিকার ক্ষেত্রেই ত্রিবেণী হয়ত এক অসামান্য সৃষ্টি বলে গণ্য হত কিন্তু অনুরূপা দেবীর বৈদগ্ধ্য ও মনীষার বিচারে এটিকে তাঁর প্রতিভার সম্যক বিকাশ বলা যায় না।

১৮৮২ সালে অনুরূপা দেবীর জন্ম। পিতা মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় এবং পিতামহ মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়। আইন ব্যবসায়ী স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মজঃফরপুরেই বসবাস করতেন। অগ্রজা ইন্দিরা দেবীর প্রেরণায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। রাণী দেবী এই ছদ্মনামে লেখিকা তাঁর প্রথম গল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করেছিলেন। বাংলা ১৩১৯ সালে 'পোষ্যপুত্র' ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এবং সেই থেকে অবিরাম অবিশ্রাম চলে তাঁর সাহিত্য ও সমাজসেবা। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার সহযোগে মজঃফরপুরে মহিলাদের জন্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করেন। এছাড়া তিনি যুক্ত ছিলেন কাশী ও কলকাতার বহু কন্যাবিদ্যাপীঠের সঙ্গে। প্রতিষ্ঠা করেন

একাধিক নারী কল্যাণ সমিতির, যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১৯৩০ সালে নারী সমবায়ের প্রতিষ্ঠা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৫ সালে জগত্তারিণী এবং ১৯৪১ এ ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মান জানায় এই শ্রদ্ধেয়া মহিলা লেখিকাকে। ১৯৫৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী অনুরূপা তাঁর পিতামহের আদর্শ ও ভাবধারার সার্থক উত্তরসাধিকা। যে সময় মধুসূদন প্রচন্ড উল্কার মত অবতীর্ণ হয়ে সাহিত্যে ও চিন্তার জগতে নতুন যুগের সূচনা করলেন, তখন ভূদেবের মনীষা ও সাধনা ব্যাপৃত রইল প্রাচীন ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটন ও প্রচারণায়। সাহিত্যসেবী হিসাবে রক্ষণশীলতার অপবাদ সত্ত্বেও ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর শালীনতা, মার্জিত আচরণ ও সংযত আভিজাত্যের জন্য সকলের শ্রদ্ধার্হ। অনুরূপা দেবীও সেই আদর্শ ও ভাবধারায় আজীবন প্রতিপালিতা হয়ে সাহিত্য সাধতায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাই একটা শুচিতা, সংযম ও আভিজাত্যের স্পর্শ তাঁর রচনায় উপলব্ধি করা যায়। পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ, সনাতন আদর্শ ও ধর্মবোধকে দলিত ও পযুর্দস্ত করে তিনি কিছু রচনা করেন নি, রচনার শিল্পসৌকর্য বৃদ্ধির জন্যও নয়।

তাঁর আজীবন সাহিত্য সাধনা ও সমাজ সেবায় চারিত্রিক এই দিকটিই বিশেষভাবে নজরে পড়ে। পণপ্রথা, পুরুষের বহুবিবাহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিনি লেখায় ও কাজে ছিলেন সমানভাবে সক্রিয়। ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগ, হিন্দু কোড বিলের যে বিরোধিতা তিনি করেছিলেন তার মধ্যেও এই মানসিকতা প্রকটিত। শিল্পের জন্য তিনি সাহিত্যসৃষ্টি করেন নি বরং সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে দেশ ও সমাজসেবাই তাঁর ব্রত ছিল। এদিক থেকে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও ভূদেবচন্দ্রের একান্ত অনুগামিনী।

কালের নির্মম কবলে তাঁর অনেক রচনা নির্মজ্জিত হলেও মহিলা লেখিকা হিসাবে প্রথম সার্থক ও উচ্চমানের সাহিত্যসৃষ্টির কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই বিস্মৃতির একটা আবরণ সত্ত্বেও তাঁর রচনার সাহিত্যমূল্য কোনদিনই বিলুপ্ত হবে না।

অমরেন্দ্র ঘোষ (১৯০৭—১৯৬২)

একহাতে রেশন তোলার ব্যাগ আরেক হাতে পাণ্ডুলিপি নিয়ে যদি কাউকে ঘুরতে হয় প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে তবে কারো পক্ষে মহৎ কোন সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব? অমরেন্দ্র ঘোষের বেলায় তাই হয়েছিল। একদিকে নিদারুণ অর্থাভাব, পরের দিন কিভাবে অন্নের সংস্থান হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, যদি কোন প্রকাশক সহৃদয়তার বশে পাণ্ডুলিপি মনোনীত করে অগ্রিম কিছু অর্থ প্রদান করেন তবেই হয়ত নশ্বর এই দেহটাকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব, নইলে সপরিবারে অনশন, এই অবস্থার মধ্যেই অমরেন্দ্র ঘোষকে সাহিত্যসাধনা করতে হয়েছিল। সুতরাং তাঁর হাত থেকে যে সৃষ্টি আমরা পেলাম তাতে একদিকে রূঢ় কঠোর বাস্তব, অনাবিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রভূত পরিমাণেই রইল কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাক আরো গভীর উপলব্ধি ও মননশীলতার মাধ্যমে সমুন্নত করার অবকাশ ছিল না। ফলে একদিকে তাঁর নূতনত্ব ও একান্তভাবে বাস্তব চিত্রায়নে যেমন আমরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হই তেমনি মনে হয় কিছুটা অসম্পূর্ণতা বা অগোছালো চিন্তাধারা যেন সে সব রচনাকে কিছুটা বিবর্ণ বা অনুজ্জ্বল করে তুলেছে।

কঠোর দারিদ্র্যের সংগে অবিরত সংগ্রামে জর্জর এবং এই সংগ্রামে প্রতিভার অবক্ষয় বা অকালবিনষ্টি বাংলা সাহিত্যে খুব বিরল কোন ঘটনা নয়। সেই সুদূর অতীতে মাইকেল মধুসূদন থেকে শুরু করে সুকান্ত মানিক অনেককেই এই সর্বধ্বংসী দারিদ্র্যের শিকার হতে হয়েছিল। এঁদের সংগে আরেকটি সংযোজন অমরেন্দ্র ঘোষ। অথচ এই দারিদ্র্য তাঁর ইচ্ছাসৃষ্ট নয়, নেহাৎই নিয়তির নিষ্ঠুর হস্তাবলেপন। ফলে একজন প্রকৃত সাহিত্যমনস্ক, সাহিত্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ দারিদ্র্য আর অভাবের জন্যই প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই অস্তমিত হয়ে গেল। পঞ্চান্ন বছরের আয়ুষ্কাল বছরের নিরিখে বা সাহিত্যসেবীদের কাছে খুব কম না হলেও বেশীর ভাগ সময়ই যাঁকে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছিল, অনভিপ্রেত অনেক কর্মেই ব্যাপৃত থাকতে

হয়েছিল তাঁর পক্ষে মহৎ পদবাচ্য সাহিত্য সৃষ্টি কতটা সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। অথচ কুড়ি একুশ বছরেই তাঁর মধ্যে সাহিত্য সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছিল বিস্ময়কর পরিমাণে এবং দীর্ঘকাল সাহিত্যের অঙ্গন থেকে নির্বাসিত থেকেও পরবর্তীকালে অনেকের কাছ থেকেই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি আদায় করতে পেরেছিলেন একান্তভাবেই সাহিত্যে নিয়োজিত ছিলেন বলেই, সাহিত্যকে জীবনের সঙ্গে একীকৃত করার ফলেই। সাহিত্য তাঁর জীবনের অঙ্গীভূত ছিল নিতান্ত আক্ষরিক অর্থেই। শুধু মানসিকতা বা সাহিত্য প্রেরণা নয়, এই সাহিত্য থেকে বিরত থাকা মানেই অভাব আর অনাহার। তাই কায়িক শ্রমও তাঁকে দিতে হয়েছিল শুধু সৃষ্টির তাগিদে নয়, বাঁচার প্রয়োজনেও।

ভাবতে অবাক লাগে এই প্রতিকূলতার মধ্যে তিনি রচনা করেছিলেন চরকাশেম, দক্ষিণের বিল, যা বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ বলেই গণ্য হয়েছে। তাঁর এই অর্থসংকট বা কঠোর দারিদ্র্য যা থাকলে হয়ত আরো মহৎ কিছু আমরা পেতাম, আরো সমৃদ্ধ হত বাংলা উপন্যাসের ভান্ডার, এই ধারণা হয়ত খুব যুক্তিগ্রাহ্য নয়, তবে যে অবস্থার মধ্যে দৈনন্দিন মরণ বাঁচন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁকে দিনাতিপাত করতে হয়েছিল ; সকলের সহানুভূতি, কৃপা ও দাক্ষিণ্য নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়েছিল, তাতে নিঃসন্দেহে বলা চলে নিজের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে আরো গভীর ও সুষমামণ্ডিত করে উপহার তিনি দিতে পারেন। সর্বগুণনাশক দারিদ্র্য যে কিছু পরিমাণে তাঁর সাহিত্য গুণকেও খর্ব করবে সেটাইতো স্বাভাবিক।

বরিশাল জেলার মঠবাড়িয়াতে তাঁর জন্ম ১৯০৭ সালে। আট ভাই বোনের মধ্যে অমরেন্দ্র ছিলেন দ্বিতীয়, বড় বোন মৃণালিনী তাঁর থেকে প্রায় দশ বছরের বড়। পিতা জানকীকুমার পুলিশ বিভাগে কাজ করতেন এবং অবস্থা বেশ স্বচ্ছলই ছিল। পিতার বদলির চাকরি আর অমরেন্দ্রর প্রকৃতি ছিল দুরন্ত, তাই বড় বোন মৃণালিনীর শ্বশুরবাড়ি কলকাতার কালিঘাটেই তাঁর থাকা ও পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হল। স্কুল জীবনে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই দিন কেটে গেল। ১৯২৫ সালে ম্যাট্রিক পাশ করলেন প্রথম বিভাগে এবং ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগেই তাঁকে বিয়ে করতে হল পিতার ইচ্ছানুসারে। কলেজে পড়ার সময় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর সংস্পর্শে আসেন যার ফলে তাঁর মনে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ জন্মাল এবং লেখার প্রতি

গভীর আগ্রহ ও আন্তর তাগিদ অনুভব করেন। এই সময় বঙ্গবাণী ও কল্লোলে প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতা 'শ্মশানে বসন্ত' এবং গল্প 'কলের নৌকা'। প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে বিশেষ করে বন্ধুমহলে বেশ সাড়া পড়ে গেল এবং নবীন এই লেখকের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নিয়েও অনেকে আশাব্যঞ্জক মন্তব্য করলেন। 'কল্লোল যুগ' বইতে অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন, "কল্লোলে অনেক লেখকই ক্ষণদ্যুতি প্রতিশ্রুতি রেখে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়েছেন। অমরেন্দ্র ঘোষ তার আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কল্লোলের দিনে একটি জিজ্ঞাসু ছাত্র হিসাবে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। দেখি সে গল্প লেখে, এবং যেটা সবচেয়ে চোখে পড়ার মত, বস্তু আর ভঙ্গী দুই-ই অগতানুগ। খুশি হয়ে কলের নৌকা ভাসিয়ে দিলাম কল্লোল।"

ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে থেকেই সমাজ সেবা ও নানা সমাজ কল্যাণমূলক কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের ভাববন্যা থেকেও নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি। আর এবার সেই সঙ্গে যুক্ত হল এই গল্প কবিতা লেখা। সুতরাং আই.এস.সি পরীক্ষার প্রস্তুতি যে বিশেষ কিছুই হয় নি সেই চিন্তাই তাঁকে অস্থির করে তুলল। এই সঙ্গে এদিক ওদিক থেকে সাহিত্য খ্যাতিও কিছুটা আমদানি হতে থাকল। ভগ্নীপতি প্রমাদ গুণলেন। যে উদ্দেশ্যে অমরেন্দ্রকে কলকাতায় রাখা, সেটাই বানচাল হতে চলেছে। তাই তিনি অমরেন্দ্রর পিতাকে সব জানিয়ে চিঠি লিখলেন এবং অবিলম্বে পিতার কাছ থেকে নির্দেশ এল অমরেন্দ্রকে যেন দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অমরেন্দ্রর কলেজ জীবন এখানেই সমাপ্ত।

কলকাতার পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেন নতুন অচেনা এক পরিবেশের মধ্যে নিমজ্জিত হলেন। পর পর সব ঘটনা ঘটল যাতে দারিদ্র্য আর অভাব ক্রমশই তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে গ্রাস করে ফেলল। বিষয় সম্পত্তি, জমি-জমা এসব তদারকি করতে গিয়ে টের পেলেন, উপরে যতই প্রাচুর্য আর আড়ম্বর থাক না কেন, তলে তলে সবই প্রায় নিঃশেষ। মামলা মোকদ্দমা, দেওয়ানী আর ফৌজদারী আদালতেই সব ধনসম্পত্তি বিলিয়ে দিতে হল। সঙ্গে যুক্ত হল জ্ঞাতি ও আত্মীয়স্বজনদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র। কিন্তু অমরেন্দ্র দমলেন না। চাষবাস শুরু করেন নতুন উদ্যমে, খেটে খাওয়া মানুষ-দের সঙ্গে মিশে নিজে ধরেন হাল লাঙল। তাঁর নিজের ভাষায়, "ভাঙার

ভিতরই গড়ার আস্বাদ পেলাম খাসে চাষ জুড়ে। অংকুরে বীজধানে প্রাণের স্পন্দন। আমি নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম নতুন সৃষ্টিতে। দায়িত্ববোধের একটা মাদকতা আছে। এতগুলো মুখে জোগাতে হবে দানা এমন একটা পরিবারের দূর করতে হবে হতাশা। আমি ঝড় তুফান রৌদ্রের মধ্যে যেন নেশায় মশগুল হয়ে খাটতে লাগলাম। ভাঙা স্বাস্থ্য ও জোড়াতালি দিয়ে চলল বেশ। দামী ডাক্তারী ওষুধ বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিলাম। এবার টুকটাক কবিরাজী নয়ত মুষ্টিযোগ। তারপর স্রেফ খাই-সোডার উপর নির্ভর। মাসে পাঁচ পো সোডা খেতাম আমি।"

কিন্তু এইভাবেও বেশী দিন চালিয়ে যাওয়া গেলনা। পারিবারিক নানা বিপর্যয়, মায়ের মৃত্যু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, পিতার মৃত্যু, সব মিলিয়ে অবস্থা প্রায় দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। এর উপর প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঝড়, বন্যা, মহামারী এবং সর্বশেষ দেশ বিভাগের প্রাকালে হিন্দু মুসলমান দাংগা, কলকাতার দাংগা, নোয়াখালীর দাংগা; পাকিস্থানের জন্মলগ্ন সব কিছু মিলে সেই গ্রামীন জীবনকে অসহনীয় করে তুলল। মান সম্ভ্রম নিয়ে পূর্ববংগে থাকার কোন সম্ভাবনা নেই বুঝে অমরেন্দ্র কলকাতার অনিশ্চিত জীবনে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হলেন। কলকাতা আসার আগে শেষবারের মত চেষ্টা করেছিলেন দেশে থাকতে, বরিশাল শহরে কিছুদিনের জন্য আস্তানা বেঁধে। কিন্তু পরের অনুগ্রহ আর নিগ্রহে সেখানে বেশীদিন থাকা সম্ভব হয় নি। তাই দেশ বিভাগের কিছু আগেই তিনি কলকাতা চলে এলেন। সেই পুরানো শহর, যেখানে কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের অনেক স্বপ্ন ও সাধনা ঘিরে রেখেছিল তাঁকে, সেখানেই উন্মেষিত হয়েছিল প্রথম সাহিত্য প্রেরণা। তাই হয়ত এই কলকাতাতেই তাঁর স্বপ্ন বাস্তব হবে। তাঁর আদর্শ রূপায়িত হবে এই ভেবে অজানা এক জীবনে পাড়ি দিলেন অমরেন্দ্র।

দেশ বিভাগের পর ছিন্নমূল শতসহস্র নরনারীর মধ্যেই একজন হয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু কোন ক্যাম্পে বা সরকারী শিবিরে তিনি যান নি, কারণ তখন তাঁর মনে একটাই বাসনা—সাহিত্য সৃষ্টি, যার দ্বারা জীবন নির্বাহ হবে আর অনেক অকথিত বার্তা পেঁৗছে দেবেন সকলের দরবারে! বিশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সান্নিধ্যে যাদের সংসর্গ তিনি পেয়েছেন সেই অগণিত মানুষের প্রাণের আকৃতিকে ভাষায় ব্যক্ত করে দেবেন তিনি। তাই যদি কোন ক্যাম্পে

যাওয়া হয় তো সব লন্ডভন্ড। টালিগঞ্জে একটি ঘর ভাড়া করে সেখানে সপরিবারে নতুন জীবন শুরু করলেন। নতুন জীবন অর্থে নিত্য নতুন অভাব, অনটন, জীবনধারণের মরণান্তিক সংগ্রাম।

আর এই অবস্থার মধ্য দিয়েই শুরু হল তাঁর নতুন জীবন, দ্বিতীয় জন্ম, সাহিত্যের ভিন্নতার পর্ব। সেই কবে প্রায় বিশ বছর আগে কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে, সেই সংগে সাহিত্যচর্চাকেও। যদিও মাঝে মাঝে উতলা উন্মনা হয়ে যেতেন, একটা বিরাট শূন্যতা আর অভাববোধ করতেন। তবুও উপায় বা অবকাশ ছিল না কোন সাহিত্যচর্চার। তবে মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছিল অনেক ঘটনা, কাহিনী ও চরিত্র যা এই নবপর্যায়ের লেখার উপাদান ও প্রেরণা হয়েছিল। বরিশাল থাকতেই তিনি 'দক্ষিণের বিল' লিখতে শুরু করেন কিন্তু সেখানের স্বল্প মেয়াদী অনিশ্চিত জীবনে এই বিরাট গ্রন্থের সূচনাই মাত্র হয়েছিল, সমাপ্ত হল কলকাতার জীবনে।

এখানের জীবনে যে নিদারুণ অভাব ও দারিদ্র্যের করাল গ্রাস তাঁকে এবং গোটা পরিবারকেই নিশ্চিহ্ন করে দিতে উদ্যত হয়েছিল তাই তাঁর সাহিত্যের নিরন্তর প্রয়াসকে বাঁচিয়ে রাখল। যদি স্বচ্ছলতা বা স্বাচ্ছন্দ্য থাকত এই জীবনে, তবে প্রাতিনিয়ত লেখার এই তাগিদ থাকত না। কারণ যখনই কলমের বিরাম তখনই অনাহারের হাতছানি। সুতরাং এই নিষ্পেষী অভাব যেমন একদিকে তাঁর লেখনীকে সচল রেখেছিল তেমনি লেখাকে উন্নত ও সমৃদ্ধতর করার অবকাশ থেকেও বঞ্চিত করেছিল। এই সময়ের তিনি বর্ণনা করেছেন জবানবন্দীতে, দীর্ঘদিনের কথা না ভেবে, আমরা অল্পদিনের কথা স্থির করে নিলাম। মাসের কথা না ভেবে, পক্ষের। এবার সাম্যবাদকে জীবনবাদে প্রয়োগ করলাম। যেন লড়াইয়ে নেমেছি। ব্যক্তি এখানে বড় নয়, বড় সংসার। ছোট বড় সকলের শ্রম, অর্থ, প্রতিভা দিয়ে একে বাঁচিয়ে রাখা চাই। আমি লেখার গতি বাড়িয়ে দিলাম স্থিতধী হয়ে। আমরা স্থির করে নিলাম যে আমাকে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি একটা কিছু হবে, অন্য কাউকে দিয়ে সে আশা নেই। হাতের টাকা দিন দিন ফুরিয়ে আসছে, তবু একটা প্রশান্তির দুর্গপ্রাচীর গড়ে নিয়েছি। এমনি দুর্গপ্রাকারে নিজেকে সুরক্ষিত করে চিরদিন সংগ্রাম করে এসেছি। সম্পৃক্ত অথচ বিমুক্ত এই আপাত বিরোধেরও সমন্বয় সাধন করতে হয়েছে বাঁচার তাগিদে। এটা বাস্তবের তিক্ততাকে অস্বীকার করা নয়,

বরং বলব তা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় মাত্র।" এই ভাবেই অমরেন্দ্রজীবন বয়ে চলেছিল কলকাতায়, কখনো আশার আলোতে কিছুটা উজ্জীবিত, আবার কখনো অন্তহীন হতাশায় উদ্বেলিত।

একটাই ছিল আশার কথা, জ্ঞানীগুণী বিদগ্ধজন ও সাহিত্যিক অনেকের কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন সহানুভূতি ও সাহায্য। ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ও শুভানুধ্যায়ীবৃন্দ ছাড়াও ছিলেন লেখক ও প্রকাশক, ছিলেন প্রতিবেশীরা যারা অমরেন্দ্রর প্রতিভা সামর্থ্যকে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর সাহিত্যসাধনার বিকাশ চাইতেন। তাই যখনই অনটন আর অনাহারের সম্মুখীন হয়েছেন তখনই তাঁরা এগিয়ে এসেছেন অকৃপণ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। এই সব শুভানুধ্যায়ী ও অনুরাগীবৃন্দের মধ্যে আছেন প্রাণতোষ ঘটক, দিলীপ গুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, অতুল গুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সজনীকান্ত এবং আরো অনেকে। তাঁর সাহায্যের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক প্রমথ বিশী, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। এঁদের প্রত্যেকের আবেদনপত্রেই অমরেন্দ্র ঘোষ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, তাঁর সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে আন্তরিক ও সশ্রদ্ধ উল্লেখ। আর এরই জন্য ভারত সরকার তাঁকে মাসিক অনুদান দিয়েছিলেন ১৫০ টাকা করে, রাজ্য সরকারও এককালীন সাহায্য করেছিলেন।

নিরন্তর সংগ্রামে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল অনেক আগেই! মাঝখানে ট্রপিক্যালে ভর্তি হতে হয়েছিল; সেখানে থেকেই তিনি আত্মজীবনী জবানবন্দী লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। "তাই তো বাঁচতে চাই। আমার তুচ্ছ এ জীবনের জবানবন্দী শোনাবার জন্য নয়। আমি কণ্ঠ—তোমরা গান, আমি ভেলা—তোমরা যাত্রী, আমি আরশি—তোমরা জ্যোতি, এই অনুভূতিগুলি দরদীয়া, মরমীয়া পাঠক—জাতির কাছে পৌঁছে দিতে চাই।" জনতার কাছে পৌঁছে দেবার জন্যই জবানবন্দী, যার ভিতরে ধরা রয়েছে অমরেন্দ্রর সকল চিন্তা, ভাবনা আদর্শ, দরিদ্র ও বঞ্চিত জনসাধারণের জন্য সহমর্মিতা ও একাত্মতা। তাঁর দুরারোগ্য ব্যাধি ক্রমশই জটিল থেকে জটিলতর হতে লাগল এবং এদিকে তাঁর জবানবন্দীও শেষ হয়ে এল। ১৯৬২ সালের ১৪ জানুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয় এবং বলতে দ্বিধা নেই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেন তিনি বিস্মৃতির গহনে নিমজ্জিত হয়ে গেলেন। যদিও ইদানিং দু একজন তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে চর্চা

করছেন কিন্তু সাধারণ বাঙালী পাঠকের কাছে তিনি এখনো বিস্মৃত এবং এই বিস্মৃতি খুব সহজে যে অপসৃত হবে তারও সম্ভাবনা খুবই কম।

'চরকাশেম' তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস, অবশ্য একই সঙ্গে বেরিয়েছিল পদ্মদীঘির বেদেনী, যমজ ভাই বোনের মত। এর পর থেকে আরো অনেক উপন্যাস প্রকাশিত হল, মোট সংখ্যা প্রায় সতের-আঠারো। গল্পগ্রন্থ আছে 'কুসুমের স্মৃতি' এবং স্ব-নির্বাচিত গল্প। অন্যান্য উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হল 'দক্ষিণের বিল', 'কনকপুরের কবি', 'বেআইনী জনতা', 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে' এবং 'মন্মন'। এবং উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি আত্মজীবনীমূলক রচনা 'জবানবন্দী।' আর এ সবের মধ্যে যে দুটি উপন্যাস যে কোন নিরিখেই কালজীর্ণ তা হল চরকাশেম এবং দক্ষিণের বিল। এই উপন্যাস দুটি একসময় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল, শুধু তাই নয়, রসিক এবং বিদগ্ধ সমালোচকবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। উপন্যাস ছাড়া তিনি লিখেছেন অনেক ছোট গল্প, যার কিছু প্রকাশিত এবং কিছু অপ্রকাশিত আর কিছু কবিতা। একসময় সাহিত্যজীবন শুরু হয়েছিল কবিতা ও ছোটগল্প লেখার মধ্য দিয়ে।

তাঁর ছোট গল্পগুলি রচিত হয়েছে জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই। কুসুমের স্মৃতি, ভেজাল, বাঁদী, কসাই, বনলতা সোম, সব গল্প কটিই তাঁর অশ্রু ও বেদনাময় অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির স্বাক্ষর। দুর্ভিক্ষ, বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু জীবন ও সমস্যা নিয়ে তিনি ছোট গল্প লিখেছেন ফলে বাস্তবতা কোথাও লঙ্ঘিত হয় নি। অবশ্য মাঝে মাঝে কল্পনা ও অতিরঞ্জন যে হয়নি তা নয়, কিন্তু একটা পরিমিতিবোধ ও মাত্রাজ্ঞান সে সবকে কাল্পনিক অলীকের পর্যায়ে নিয়ে যায় নি। ছোট গল্পের সংজ্ঞানুযায়ী সবগুলি যে রসোত্তীর্ণ বা অতি উচ্চমানের তা নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু বাস্তবানু-গতা ও সূক্ষ্ম মানবতাবোধ তাঁর সব লেখার মধ্যে পরিব্যাপ্ত, এই ছোট গল্পগুলিতে তার নিদর্শন রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। বাঁদী বা কসাই-এর গল্প যাঁর লেখনী থেকে বেরিয়েছে, ছোটগল্প লেখকের পর্যায়ে তাঁর আসন খুব অপাংক্তেয় নয়। মধ্যবিত্ত জীবনের সংশয়, দ্বিধা, টানা পোড়েন, তাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যথা, যন্ত্রণা এবং ক্রমাবক্ষয়ের চিত্রও তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ক্লিষ্টতা ও বিবর্ণতা এত মাত্রাতিরিক্তভাবে প্রকটিত যে চিত্রগুলি সজীব চরিত্র হয়ে ওঠে নি। তাঁর বাস্তবানুসরণ ও জীবনচিত্রন

এত প্রত্যক্ষ ও অকৃত্রিম হয়ে উঠেছে যে গল্প হিসাবে সে সব অধিকাংশই বিবরণ বা বর্ণনার মত ফুটেছে, গভীর জীবনবোধে সম্পৃক্ত কোন রসসমৃদ্ধ চিরন্তন বাণীর বাহক হয়ে ওঠেনি। সে জন্য তাঁর জীবন ও জগৎকে দেখার যে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ বা মানসিকতা ছিল সেটাই দায়ী। অতিরিক্ত বস্তুনিষ্ঠার ফলে নির্বস্তুক ভাবরাজ্যের দৈর্ঘ্য মাঝে মাঝে তাঁর এই সব ছোটগল্পে প্রকটিত।

যাইহোক, অমরেন্দ্র ঘোষের আপন সাম্রাজ্য উপন্যাসের ক্ষেত্র। জীবনে যত লোকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছেন, ছাত্রাবস্থা থেকে শুরু করে আমৃত্যু কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে বিরাট বিস্তৃত অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন সকলই প্রতিমূর্ত হয়েছে তাঁর উপন্যাসগুলিতে। বিশেষ করে সমাজের নীচুতলার মানুষেরা তাদের প্রকৃত মানুষী সত্তা নিয়েই তাঁর উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এখানে একদিকে তিনি যেমন অকৃত্রিম বাস্তবানুসারী, তেমনি স্রষ্টার মত নির্লিপ্ত, নিরপেক্ষ।

'চরকাশেম' তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস, রচনাশৈলী ও চরিত্রচিত্রনেও বোধ হয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। যদিও দক্ষিণের বিলে আরো বৃহত্তর পটভূমি ও গভীর জীবন সমীক্ষার সন্ধান রয়েছে। দুটি উপন্যাসেই আঞ্চলিকতা পরিব্যাপ্ত হয়েছে দেশ কালের গন্ডী পেরিয়ে বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে। পূর্ব বাংলার একটি বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে সেখানের মানুষের সুখদুঃখের কাহিনীকে উপজীব্য করে যদিও দুটি উপন্যাস রচিত হয়েছে কিন্তু সকল আঞ্চলিকতাকে ছাপিয়ে মানুষের, যে মানুষ সকল দুর্বিপাকেও নিজেকে উন্নত ও আশাবাদী রাখতে সচেষ্ট ও সক্রিয়, তার জয়গানেই তা মুখরিত। এক উজ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন, সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যেন অতি নিকট বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে উপন্যাসদুটির নরনারীর মধ্যে।

হাসেমের ছেলে কাশেম। অতি অল্প বয়সে বাপকে হারিয়ে কাশেম অন্য বাড়ীতে গোলামীর কাজ নেয়। কিন্তু এই জীবন তার অসহ্য ঠেকে তাই গোলামী ছেড়ে দিয়ে পৈতৃক ব্যবসা মাছের কারবার শুরু করে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে সে কিছু অর্থ সংগ্রহ করল মাছ বেচে আর অন্যের জমিতে মজুরী করে। তখন তার মনে জাগে এক স্বপ্ন, যদি কখনো চর জাগে সে হবে চরের মালিক আর চরের নাম হবে তারই নামে চরকাশেম। "চর তো নয় দুধের সর,

এখনো বাঁও মেলে না অথৈ জল, তবু ভাবে কাশেম, স্বপ্ন দেখে পাগলা। সুখের স্বপ্ন, সাধের স্বপ্ন। একদিন এ চর জাগবে। মানুষ, গরু-বাছুর হাঁস-পায়রা-মোরগে ভরে যাবে চরের বুক। মানুষের হবে ছেলে মেয়ে, গরুর হবে বকনা আর দামড়া বাছুর, হাঁস মুরগী চারিদিক ঘিরে কিলবিল করবে, কদম ফুলের মত সব ছানা! আঃ কি নরম বুক জুড়ান পাখির বাচ্ছা সব। ...হাসেমের ছেলে কাশেম তার নামেই চরের নাম হবে। সাত গাঁয়ের লোক, এপার ওপারের মাঝিরা আঙুল তুলে দেখাবে—ঐ চরকাশেম ঐ।"

এই স্বপ্নের সঙ্গে আরেকটি স্বপ্ন আছে তার। যে বাড়ীতে এককালে বান্দাগিরি করত সেই প্রভুরই মেয়ে ফুলমনকে বিয়ে করে সংসার পাতবে। যে ফুলমন তাকে কখনো মানুষ বলে ভাবে নি, কাশমা ছাড়া ডাকে নি, তাকেই সে বিয়ে করবে, নতুন চরে তাকে নিয়েই ঘর বাঁধবে। তার স্বপ্ন সফল হয় অন্তিমে, তবে অনেক ঝড় জল দুর্গতির মধ্য দিয়ে। মন্বন্তর, মহামারী, বন্যা সব কিছু মিলে কারবার নির্মূল করে দিতে চেয়েছে এই চরের মানুষদের আশা ভরসা। তার উপর রয়েছে জমিদার, মহাজন শাসকদের উৎপীড়ন। কিন্তু তারা সেই অত্যাচারকে মাথা পেতে নেয় না। "প্রতিকার না হলেও প্রতিবাদ করতে হবে অন্যায়ের, মাথা পেতে সইলেই অন্যায় আরো উদ্ধত হয়ে ঘা মারবে।— উপোসী চোখগুলো হঠাৎ জ্বল জ্বল করে ওঠে। কি যেন বার্তা শুনেছে, মহান! কি যেন পথ দেখেছে অন্ধকারে।" আর চরকাশেমের শেষ কথা, "সব গরিবের হুঙ্কারে এক করতে হবে" এবং সবশেষে "দূর নদীবক্ষ থেকে একটা প্রতিধ্বনি ভেসে আসে—যেতে হবে, যেতে হবে একটা কঙ্কালকেও আজ আশা বুকে নিয়ে মাথা খাড়া করে প্রতিবাদ করতে যেতে হবে।" অতি সামান্য মানুষ এই চরের বাসিন্দারা কিন্তু অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে তারা রুখে দাঁড়াবে, এই বলিষ্ঠ বাণী ছড়িয়ে দিয়েছে সকলের মনে জীবনের ও জীবিকার তাগিদে। অতি ক্ষুদ্র পরিসর, জীবনের বহুমুখিনতা নেই, কিন্তু অতি গভীর অন্তরঙ্গতায় সর্বকালীন ব্যাপ্তি লাভ করেছে এই মানুষেরা।

'চরকাশেম' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল মূলত এর অভিনবত্বের জন্য। পূর্ব বাংলার যে প্রত্যন্ত প্রদেশের লোকেরা তাদের ছোট জীবন, ছোট আশা আকাংক্ষা নিয়ে কোনক্রমে দিন যাপন করে তারা যে উপন্যাসের মুখ্য উপাদান হয়ে উঠতে পারে এই ধারণাই অনেকের কাছে বিস্ময়ের।

এখানে একটি বিশেষ অঞ্চলের অন্তরঙ্গ চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। পদ্মানদীর তীরবর্তী চাষী, মাঝি ও জেলেদের চরিত্র অকৃত্রিমতায় অংকিত হয়েছে। অতি দরিদ্র হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর চাষীজীবনের সুখদুঃখের বর্ণনা, দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা এই চরের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেই রয়েছে। বাইরে থেকে কোন বিচ্ছেদের কেউ আসলেও তারা নিজেদের প্রয়োজনেই তা মিটিয়ে দেয়। এমন কি, তারা যে ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত এই চিন্তাটাও তাদের মনে কখনো আসে না। কাশেম, ফুলমন, রসময়, আঞ্জু, ফরিদ, জীবন হালদার সকলেই এই অঞ্চলের সন্তান; দেশজ, ভূমিজ সব ধ্যান ধারণা সংস্কার নিয়েই তারা পরিপালিত। এই চর, এই পদ্মা তাদের সব ভাবনা চিন্তার কেন্দ্র বিন্দুতে।

বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিকতাময় উপন্যাস আরো রচিত হয়েছে। তারাশংকর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী অনেকেই স্মরণীয় উপন্যাস লিখেছেন একটি বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীদের কেন্দ্র করে। তাঁদের উপন্যাসগুলি নিয়ে যে পরিমাণে আলোচনা হয়েছে অমরেন্দ্র ঘোষের উপন্যাস নিয়ে তা হয় নি। হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, পদ্মানদীর মাঝি বা ঢোঁড়াই চরিত মানস, এই সব কালজয়ী উপন্যাসের সংগে 'চরকাশেম'ও উল্লেখের দাবী রাখে নিঃসন্দেহে। যে বৃহত্তর জীবনবোধ বা উচ্চ শ্রেণীর শিল্পনৈপুণ্যে ঐ সব উপন্যাস চিরন্তন সম্পদের তালিকাভুক্ত, হয়ত চরকাশেমে তার কিছুটা অভাব রয়েছে কিন্তু বিশেষ একটি অঞ্চলের সুনিপুণ বর্ণনায়, সেখানের অধিবাসীদের সুনিবিড় চিত্রণে চরকাশেম কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়। বিশেষ দেশ ও অঞ্চলের রীতি-নীতি, আচার-সংস্কারে সীমাবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যে দৃষ্টি ও চিন্তার উন্মেষ, স্থান ও কালের সীমানা পেরিয়ে সেই বোধ ও ধারণা যদি বৃহত্তর মানব সমাজের আশা প্রত্যাশাকে রূপায়িত করে তবেই সেই আঞ্চলিক সাহিত্যের সার্থকতা। আর চরকাশেমের ক্ষেত্রে চরের গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষেরা যখন এক হয়ে সংকল্প নেয়, একসংগে জীবনের সংগ্রামে ঝাঁপ দিতে শপথ নেয় তখন তা সেই চরে সীমাবদ্ধ থাকে না, সর্বকালীন সর্বস্থানিক রূপ পরিগ্রহ করে। আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে চরকাশেম তাই অভিনন্দনীয় একটি সার্থক সৃষ্টি।

'পদ্ম মীঘির বেদেনী' উপন্যাসটিও একটি বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ সম্প্রদায়কে নিয়ে লেখা। যাযাবর বেদে সম্প্রদায়, একস্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়ায়।

কোথাও কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই, নৌকায় নৌকায় চলে এদের জীবন প্রবাহ। এই সম্প্রদায়ের জীবন আলেখ্য এই উপন্যাসে। ময়না এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র, সঙ্গে রয়েছে সাধু ভৈরব, নয়ন, গোপী, শ্যামলী, রাজা বাহাদুর এবং যাযাবর বেদে ও বেদেনীর দল। ঔপন্যাসিক গুণাবলী যথেষ্ট থাকলেও পদ্ম-দীঘির বেদেনী অমরেন্দ্র ঘোষের প্রতিভার সার্থক প্রকাশ নয়। কারণ যে অকৃত্রিমতা ও স্বাভাবিকত্ব তাঁর লেখার প্রধান পরিচয়, সেটাই এখানে অনেকটা অনুপস্থিত। অসঙ্গতি এবং অতিরঞ্জনও আছে প্রচুর।

অনেক চরিত্রে ঠাসা, অনেক ঘটনায় ভরা উপন্যাস 'দক্ষিণের বিল'। এর পরিকল্পনা বিরাট এক পটভূমিতে। অভিজ্ঞতা ও আদর্শের মিলনে তিনি এটিকে সর্বকালীন একটি মানবদলিল রূপেই সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এই উপন্যাসটি তার দীর্ঘদিনের সাধনার ফসল। বহুবার বহুভাবে তিনি শুরু করেছিলেন আবার নিজেই তা বাতিল করে নতুনভাবে লিখেছেন। আর লেখার সময় বাধা বিপত্তিও এসেছে প্রচুর। দেশে থাকতেই এর সূচনা হয়েছিল। কল্পনা করেছিলেন তারও অনেক আগে। যদি বারবার খণ্ডিত চিন্তায় দ্বিধাগ্রস্তভাবে এটি লেখা না হত তবে আরো সুসংহত, সুপরিণতভাবেই আমরা 'দক্ষিণের বিল' পেতাম এবং বাংলা সাহিত্যে এপিক বলে যে কটি উপন্যাসের স্বীকৃতি আছে সেই সবের মধ্যে এটিরও সগৌরব আসন হত। "এই উপন্যাসের সঙ্গে আমাদের বংশানুক্রমিক সম্বন্ধ জড়িত। নায়ক বিপ্রপদ সেকালের প্রতিভূমূলক চরিত্র। নায়িকা কমলকামিনীও তাই। কিন্তু আমার পিতা ও মাতাকে কেন্দ্র বিন্দুতে রেখেই কম্পাস ঘুরিয়েছি।" লেখকের এই জবানবন্দীতে প্রতীয়মান হবে যে অনেক বড় ক্যানভাসেই তিনি এটি আঁকতে চেয়েছেন, এঁকেছেনও এবং অসংখ্য ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশে উপন্যাসটি এপিকসুলভ বিশালতা ও ব্যাপ্তি লাভ করেছে, তবুও যেন প্রকৃত অর্থে মহৎ সৃষ্টি হয়ে ওঠেনি।

'দক্ষিণের বিল' এর ভূমিকাতে লেখক জানিয়েছেন, "বিগত একশ বছর ধরে পূর্ব বাংলার গ্রামীন সভ্যতা কিভাবে ব্যষ্টির থেকে গোষ্ঠীর দিকে ধীরে ধীরে সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে, তারই চিত্র এ উপন্যাস।" উপন্যাসের নায়ক বিপ্রপদকে কেন্দ্র করেই বিলের সকল মানুষের উন্নতি, অবনতি। সে ধীরে ধীরে অতি সামান্য অবস্থা থেকে উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করেছেন এবং সেই উন্নতির সঙ্গে জড়িত রয়েছে উচ্চ, মধ্য এবং নিম্নবিত্ত অসংখ্য মানুষ, হিন্দু মুসলমান,

উচ্চ এবং নিম্নবর্ণ। এক শতাব্দী ধরে এই মানুষ যে শোষণ নিপীড়ন বঞ্চনার শিকার আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণের মনে যে তীব্র বিক্ষোভ ও অসন্তোষ, ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে, বিপ্রপদর জীবন-ভাষ্যে তাই রূপ পেয়েছে। এর সঙ্গে আছে বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং মুক্তিসংগ্রামের প্রচণ্ড আলোড়ন ; লেখক সব কিছুকে মিলিয়ে আগামী দিনের পাথেয় করে দিতে চেয়েছেন শোষণ ও অত্যাচার বিমুক্ত এক সমাজের প্রতিশ্রুতিতে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পতন উত্থান সবই বিবৃত হয়েছে এই উপন্যাসে এবং নায়ক বিপ্রপদ সেই সুখময় ভবিষ্যতেরই দ্বারোদ্ঘাটন করে দিয়েছে। তার মুখের ভাষাই উপন্যাসের মূল ভাষ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। "শোন তোমরা, জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচেনা, ফসল ছাড়া তেমনি মানুষ বাঁচে না। যে মড়ক দেখে আজ ভয় পাচ্ছ, সে মড়ক তোমাদের ঘরে ঢুকবে, যদি শুধু হাতে বাড়ী ফেরো। মন্বন্তরের কথা শোননি ? ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলা জোড়া আকাল ? আজ আমি শপথ করছি, এ জমিতে নতুন স্বত্ব হবে—যৌথ স্বত্ব, খামারও হবে যৌথ। প্রজা মনিবের অস্তিত্ব থাকবে না।"

'কনকপুরের কবি', 'জোটের মহল' প্রভৃতি উপন্যাসও পূর্ব বাংলার পটভূমিতে লেখা এবং আঞ্চলিকতায় সমৃদ্ধ। এই সব উপন্যাসে তাঁর সমাজ চেতনা, বামপন্থী মনোভাব যেমন ব্যক্ত হয়েছে তেমনি নিসর্গপ্রীতি, প্রকৃতি বর্ণনাও পাশাপাশি এসে তাঁর অসাধারণ শিল্পী চেতনাকে প্রকাশ করেছে।

'ভাঙছে শুধু ভাঙছে' দেশ বিভাগ ও হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত উপন্যাস। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যে অকথ্য নির্যাতন ও অত্যাচারে কবলিত হয়েছিল তারই করুণ প্রতিচ্ছবি এই কাহিনী। গণহত্যা, সম্পত্তিলুঠ, ধর্ষণ এবং অবশেষে ভিটেমাটি ছেড়ে পলায়ন সবই আছে. কিন্তু লেখক কোন বিদ্বেষ বা শত্রুতার মনোভাব নিয়ে এসব চিত্র আঁকেন নি। বরং সেই মধ্যযুগীয় পাশবিকতার মধ্যেও অন্য শ্রেণীর মানুষের সকলের মনুষ্যত্ব ও বিবেক লোপ পায়নি, অমরেন্দ্র তাই দেখিয়েছেন।

'বে-আইনী জনতা'য় উদ্বাস্তু সমস্যা বর্ণিত হয়েছে। এই পর্যায়ের আরো উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে মন্থন, অহল্যাকন্যা, ঠিকানা বদল, রোদন ভরা এ বসন্ত প্রভৃতি। তবে নিঃসন্দেহে বে-আইনী জনতা এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কলকাতার বস্তিজীবনকে কেন্দ্র করে এর কাঠামো রচিত হয়েছে—এক দল

সর্বহারা নরনারী শিশুর জীবন সংগ্রাম—নতুন জীবনে উত্তরণের আশাবাদী বলিষ্ঠ সংগ্রামই—এই উপন্যাসের মূল কথা। এই কাহিনীর মুখ্য চরিত্র, কুলসম, কুট্টি, সখিনা ইত্যাদি, এই সমাজের অতি নীচুতলার মানুষদের, শহরের আবর্জনার সঙ্গে বেড়ে ওঠা মানুষ মানুষীদের নিয়ে এসেছেন অমরেন্দ্র ঘোষ সাহিত্যের সুসভ্য প্রাঙ্গনে। নিবিড়ভাবে এঁকেছেন এদের ছবি, বাণী দিয়েছেন এদের মুখে কিন্তু অসংগতি বা মাত্রাতিরিক্ত অনুলেপন নেই। অমরেন্দ্র ঘোষ এ সম্বন্ধে বলেছেন, "এ পরাজিত সৈনিকের ঘাঁটি ত্যাগ নয়। বিশেষ আবহাওয়ায় দুর্যোগে মাত্র বিশেষ ব্যবস্থা। এই ময়দানেই যে সমগ্র জানতার আজ জয় পরাজয় একেবারে কৃতনির্দিষ্ট হয়ে যাবে তা তো নয়। আরও আছে বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। তাই দূরদর্শী নেতা বাঁচিয়ে রাখতে চায় প্রতিটি সৈনিকের মূল্যবান প্রাণ।"

অমরেন্দ্র ঘোষের লেখার প্রধান লক্ষণীয় যা তাহল নিজের অভিজ্ঞতার বাইরে তিনি বেশী বিচরণ করেন নি। পূর্ববাংলার জীবনে, চাষবাসের সময়, দুর্ভিক্ষ-মহামারী-বন্যার সময়, বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী আস্তরণে তিনি যাদের সংস্পর্শে এসেছেন, উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবর্গের, তারাই তাঁর উপন্যাসে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। ফলে যেসব অঞ্চল ছিল অজানা, যেসব মানুষ ছিল অপরিচিত, যে জীবনযাত্রা থেকে গিয়েছিল আমাদের জ্ঞান ও ধারণার বাইরে তাদের সঙ্গেই পরিচিতি ঘটালেন অমরেন্দ্র ঘোষ। চর, বিল, খাল, নদী এসব আমাদের সাহিত্যে এসেছে কতকটা কবি কল্পনায়, কাব্যিক সুষমামণ্ডিত হয়ে, কিন্তু এই সবের এমন রূঢ়, নিকষ, বে-আব্রু রূপ আমরা তাঁর রচনার আগে খুব একটা দেখিনি। অথচ কোথাও অস্পষ্টতা বা অস্বচ্ছতা তিনি রাখেন নি বা রাখার চেষ্টা করেননি।

অমরেন্দ্র ঘোষের সাহিত্য সাধনার মৌল প্রেরণা বস্তুনিষ্ঠ জীবন সংসক্তি। এই নিষ্ঠা এতই আন্তরিক যে তাতে রং মিশিয়ে সুপাচ্য করার চেষ্টা করেননি। বাংলার বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মাঠ, ঘাট, পথ-প্রান্তরের, সেখানের অগণিত অকিঞ্চিৎকর নরনারীর পরিচয় দিয়েছেন গ্রামের মেঠো সুরে, কথকের ভঙ্গিতে, অনেকটা একান্ত আপনজনই হয়ে। কোন বাইরে থেকে দেখা নয়, একেবারে ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে সেই সব সাহিত্যে অচ্ছুৎ অস্পৃশ্যদের তিনি এঁকেছেন বাস্তবের দর্পণে। যে লোকজীবনের পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা সত্যিকারের গ্রাম্য লোকদেরই হাসি-কান্নাভরা পাঁচালি। সেখানে কোন কৃত্রিমতা, অতিরঞ্জন

কাল্পনিক বর্ণন বা মতবাদের প্রলেপন নেই। নেই বলেই তা এত বিশ্বস্ত, জীবনানুগ হতে পেরেছে।

তিনি যে প্রকৃতি ও নিসর্গের বিবরণ দিয়েছেন তা কোন রহস্যময়তা বা অতীন্দ্রিয় ভাবলোক উন্মোচন করে না বরং আমাদের সামনে মেলে ধরে সেই প্রকৃতিকে, তার মাঠ—ঘাট, নদী, নালা—যেমন ছিল ঠিক তেমনি। চরিত্রগুলির চোখ দিয়ে এই প্রকৃতিকে দেখা বলেই লেখকের কল্পনা বা ভাবের অতিরেকে তা অলৌকিক হয়ে যায়নি। শহর বা গ্রাম যাই তিনি এনেছেন তাঁর লেখায়, কখনো তাকে নিজের মত করে উপস্থিত করেন নি, যার চোখে যেমন ভাবে উদ্ভাসিত তেমনি করেই এর সন্ধান মেলে।

অমরেন্দ্র বামপন্থী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু সক্রিয়ভাবে রাজনীতি কখনো করেননি। সেইজন্যই রাজনীতির কচকচি তাঁর লেখায় খুব বেশী নেই। প্রতিবাদের আন্দোলন ও বলিষ্ঠ সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি তাঁর লেখার মর্মস্থলে রয়েছে কিন্তু জীবনের সঙ্গে একব্রতী হয়ে সেই প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞার স্ফুরণ হয়েছে। জনগণের জন্যই লেখনী ধরেছেন তিনি, তাই জনগণের উপর অন্তহীন বিশ্বাস ছড়িয়ে রয়েছে লেখার প্রতিটি ছত্রে। যেখানে এর ব্যতিক্রম সেখানেই তিনি অতি সাধারণ ও বৈশিষ্ট্যহীন। 'আশা রইল আগামীদিনের মানুষ নতুন মূল্যায়নে বসবে'—তাঁর এই উক্তির সঙ্গে আমরাও সহমত যে আগামী দিনে অমরেন্দ্র ঘোষ আরো পঠিত, আলোচিত এবং সমাদৃত হবেন।

বাংলা আকাদেমির আংশিক অর্থানুকূল্যে
এই গ্রন্থ প্রকাশিত হল।